চার অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

NATIONAL LIBRARY
No. 2052
Date ....
CALCUTTA

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চার অধ্যায়

আভাস

একদা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যখন Twentieth Century মাসিকপত্রের সম্পাদনায় নিযুক্ত তখন সেই পত্রে তিনি আমার নূতন প্রকাশিত নৈবেদ্য গ্রন্থের এক সমালোচনা লেখেন। তৎপূর্ব্বে আমার কোনো কাব্যের এমন অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাদ কোথাও দেখিনি। সেই উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপরপক্ষে বৈদান্তিক,—তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্যপ্রভাবশালী। অধ্যাত্ম বিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তাঁকেই আমার প্রথম সহযোগী পাই। এই উপলক্ষ্যে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারণ করতে করতে তিনি

আমার সঙ্গে আলোচনাকালে যে সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত হই।

এমন সময়ে লর্ড কার্জ্জন বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে দৃঢ়সঙ্কল্প হলেন। এই উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রথম হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছেদের রক্তবর্ণ রেখাপাত হোলো। এই বিচ্ছেদ ক্রমশ আমাদের ভাষা সাহিত্য আমাদের সংস্কৃতিকে খণ্ডিত করবে, সমস্ত বাঙালী জাতকে কৃশ করে দেবে এই আশঙ্কা দেশকে প্রবল উদ্বেগে আলোড়িত করে দিল। বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেল না। লর্ড মর্‌লি বললেন, যা স্থির হয়ে গেছে তাকে অস্থির করা চলবে না। সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারি মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন "সন্ধ্যা" কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকা-পন্থার সূচনা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এত বড়ো প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল।

এই সময়ে দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ

হয়নি। মনে করেছিলুম হয়তো আমার সঙ্গে তাঁর রাষ্ট্র-আন্দোলনপ্রণালীর প্রভেদ অনুভব ক'রে আমার প্রতি তিনি বিমুখ হয়েছিলেন অবজ্ঞাবশতই।

নানাদিকে নানা উৎপাতের উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। সেই অন্ধ উন্মত্ততার দিনে একদিন যখন জোড়াসাঁকোয় তেতালার ঘরে একলা বসেছিলেম হঠাৎ এলেন উপাধ্যায়। কথাবার্ত্তার মধ্যে আমাদের সেই পূর্ব্বকালের আলোচনার প্রসঙ্গও কিছু উঠেছিল। আলাপের শেষে তিনি বিদায় নিয়ে উঠলেন। চৌকাঠ পর্য্যন্ত গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, "রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে।" এই ব'লেই আর অপেক্ষা করলেন না, গেলেন চলে। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, এই মর্ম্মান্তিক কথাটি বলবার জন্যেই তাঁর আসা। তখন কর্ম্মজাল জড়িয়ে ধরেছে, নিষ্কৃতির উপায় ছিল না।

এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা ও শেষ কথা।

উপন্যাসের আরম্ভে এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।

চার অধ্যায়

ভূমিকা

এলার মনে পড়ে তার জীবনের প্রথম সূচনা বিদ্রোহের মধ্যে। তার মা মায়াময়ীর ছিল বাতিকের ধাত, তাঁর ব্যবহারটা বিচার বিবেচনার প্রশস্ত পথ ধরে চল্‌তে পার্‌ত না। বেহিসাবী মেজাজের অসংযত ঝাপ্‌টায় সংসারকে তিনি যখন-তখন ক্ষুব্ধ ক'রে তুলতেন, শাসন করতেন অন্যায় ক'রে, সন্দেহ করতেন অকারণে। মেয়ে যখন অপরাধ অস্বীকার করত, ফস্‌ করে বলতেন, মিথ্যে কথা বলছিস্‌! অথচ অবিমিশ্র সত্যকথা বলা মেয়ের একটা ব্যসন বল্‌লেই হয়। এ জন্যেই সে শাস্তি পেয়েছে সব চেয়ে বেশি। সকল রকম অবিচারের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতা তার স্বভাবে প্রবল হয়ে উঠেছে। তার মার কাছে মনে হয়েছে, এইটেই স্ত্রীধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ।

একটা কথা সে বাল্যকাল থেকে বুঝেছে, যে, দুর্ব্বলতা অত্যাচারের প্রধান বাহন। ওদের পবিবারে যে-সকল আশ্রিত অন্নজীবী ছিল, যারা পরের অনুগ্রহ-নিগ্রহের সঙ্কীর্ণ বেড়া-দেওয়া ক্ষেত্রের মধ্যে নিঃসহায়-ভাবে আবদ্ধ তারাই কলুষিত করেছে ওদের পরিবারের আবহাওয়াকে, তারাই ওর মায়ের অন্ধ প্রভুত্বচর্চ্চাকে বাধাবিহীন করে তুলেছে। এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রতিক্রিয়ারূপেই ওর মনে অল্প বয়স থেকেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এত দুর্দ্দাম হয়ে উঠেছিল।

এলার বাপ নরেশ দাশগুপ্ত সাইকলজিতে বিলিতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন। তীক্ষ্ণ তাঁর বৈজ্ঞানিক বিচারশক্তি, অধ্যাপনায় তিনি বিশেষভাবে যশস্বী। প্রাদেশিক প্রাইভেট কলেজে তিনি স্থান নিয়েছেন যেহেতু সেই প্রদেশে তাঁর জন্ম, সাংসারিক উন্নতির দিকে তাঁর লোভ কম, সে সম্বন্ধে দক্ষতাও সামান্য। ভুল ক'রে লোককে বিশ্বাস করা ও বিশ্বাস ক'রে নিজের ক্ষতি করা বারবারকার অভিজ্ঞতাতেও তাঁর শোধন হয়নি। ঠকিয়ে কিম্বা অনায়াসে যারা উপকার আদায় করে তাদের কৃতঘ্নতা সব চেয়ে অকরুণ। যখন সেটা প্রকাশ পেত সেটাকে মনস্তত্ত্বের বিশেষ তথ্য ব'লে

মানুষটি অনায়াসে স্বীকার করে নিতেন, মনে বা মুখে নালিশ করতেন না। বিষয়বুদ্ধির ত্রুটি নিয়ে স্ত্রীর কাছে কখনো তিনি ক্ষমা পাননি, খোঁটা খেয়েছেন প্রতিদিন। নালিশের কারণ অতীতকালবর্ত্তী হোলেও তাঁর স্ত্রী কখনো ভুলতে পারতেন না, যখন-তখন তীক্ষ্ণ খোঁচায় উস্কিয়ে দিয়ে তার দাহকে ঠাণ্ডা হোতে দেওয়া অসাধ্য করে তুলতেন। বিশ্বাসপরায়ণ ঔদার্য্যগুণেই তার বাপকে কেবলি ঠক্‌তে ও দুঃখ পেতে দেখে বাপের উপর এলার ছিল সদাব্যথিত স্নেহ—যেমন সকরুণ স্নেহ মায়ের থাকে অবুঝ বালকের 'পরে। সব চেয়ে তাকে আঘাত করত যখন মায়ের কলহের ভাষায় তীব্র ইঙ্গিত থাকত যে, বুদ্ধি বিবেচনায় তিনি তাঁর স্বামীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এলা নানা উপলক্ষ্যে মায়েব কাছে তার বাবার অসম্মান দেখতে পেয়েছে,তা নিয়ে নিষ্ফল আক্রোশে চোখের জলে রাত্রে তার বালিশ গেছে ভিজে'। এ রকম অতিমাত্র ধৈর্য্য অন্যায় ব'লে এলা অনেক সময় তার বাবাকে মনে মনে অপরাধী না করে থাকতে পারেনি।

অত্যন্ত পীড়িত হয়ে একদিন এলা বাবাকে বলেছিল, "এ রকম অন্যায় চুপ ক'রে সহ্য করাই অন্যায়।"

নরেশ বললেন, "স্বভাবের প্রতিবাদ করাও যা আর তপ্ত লোহায় হাত বুলিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করতে যাওয়াও তাই, তাতে বীরত্ব থাকতে পারে কিন্তু আরাম নেই।"

"চুপ ক'রে থাকাতে আরাম আরো কম"—ব'লে এলা দ্রুত চলে গেল।

এদিকে সংসারে এলা দেখতে পায়, যারা মায়ের মন জুগিয়ে চল্‌বার কৌশল জানে তাদের চক্রান্তে নিষ্ঠুর অন্যায় ঘটে অপরাধহীনের প্রতি। এলা সইতে পারে না, উত্তেজিত হয়ে সত্য প্রমাণ উপস্থিত করে বিচারকর্ত্রীর সামনে। কিন্তু কর্ত্তৃত্বের অহমিকার কাছে অকাট্য যুক্তিই দুঃসহ স্পর্দ্ধা। অনুকূল ঝোড়ো হাওয়ার মতো তাতে বিচারের নৌকো এগিয়ে দেয় না, নৌকো দেয় কাৎ ক'রে।

এই পরিবারে আরো একটি উপসর্গ ছিল যা এলার মনকে নিয়ত আঘাত করেছে। সে তার মায়ের শুচিবায়ু। একদিন কোনো মুসলমান অভ্যাগতকে বস্‌বার জন্যে এলা মাদুর পেতে দিয়েছিল,—সে মাদুর মা ফেলে দিলেন, গাল্‌চে দিলে দোষ হোতো না। এলার তার্কিক মন, তর্ক না করে থাক্‌তে পারে না। বাবাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা এই সব

ছোঁয়া-ছুঁয়ি নাওয়া খাওয়া নিয়ে কট্‌কেনা মেয়েদেরি কেন এত পেয়ে বসে? এতে হৃদয়ের তো স্থান নেই, বরং বিরুদ্ধতা আছে; এ তো কেবল যন্ত্রের মতো অন্ধ-ভাবে মেনে চলা।” সাইকলজিস্‌ট্‌ বাবা বল্‌লেন, “মেয়েদের হাজার বছরের হাতকড়ি-লাগানো মন; তারা মানবে, প্রশ্ন কর্‌বে না,—এইটেতেই সমাজ-মনিবের কাছে বক্‌শিষ পেয়েছে, সেইজন্যে মানাটা যত বেশি অন্ধ হয় তার দাম তাদের কাছে তত বড়ো হয়ে ওঠে। মেয়েলি পুরুষদেরও এই দশা।” আচারের নিরর্থকতা সম্বন্ধে এলা বারবার মাকে প্রশ্ন না ক’রে থাক্‌তে পারেনি, বারবার তার উত্তর পেয়েছে ভর্ৎসনায়। নিয়ত এই ধাক্কায় এলার মন অবাধ্যতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

নরেশ দেখলেন পারিবারিক এই সব দ্বন্দ্বে মেয়ের শরীর খারাপ হয়ে উঠ্‌ছে, সেটা তাঁকে অত্যন্ত বাজ্‌ল। এমন সময় একদিন এলা একটা বিশেষ অবিচারে কঠোরভাবে আহত হয়ে নরেশের কাছে এসে জানালো—“বাবা, আমাকে কলকাতায় বোর্ডিঙে পাঠাও।” প্রস্তাবটা তাদের দুজনের পক্ষেই দুঃখকর, কিন্তু বাপ অবস্থা বুঝলেন, এবং মায়াময়ীর দিক্‌ থেকে

প্রতিকূল ঝঞ্ঝাঘাতের মধ্যেও এলাকে পাঠিয়ে দিলেন দূরে। আপন নিষ্করুণ সংসারে নিমগ্ন হয়ে রইলেন অধ্যয়ন অধ্যাপনায়।

মা বললেন, "সহরে পাঠিয়ে মেয়েকে মেমসাহেব বানাতে চাও তো বানাও কিন্তু ঐ তোমার আদুরে মেয়েকে প্রাণান্ত ভুগতে হবে শ্বশুরঘর করবার দিনে। তখন আমাকে দোষ দিয়ো না।" মেয়ের ব্যবহারে কলিকালোচিত স্বাতন্ত্র্যের দুর্লক্ষণ দেখে এই আশঙ্কা তার মা বারবার প্রকাশ করেছেন। এলা তার ভাবী শাশুড়ির হাড় জ্বালাতন করবে সেই সম্ভাবনা নিশ্চিত জেনে সেই কাল্পনিক গৃহিণীর প্রতি তাঁর অনুকম্পা মুখর হয়ে উঠ্‌ত। এর থেকে মেয়ের মনে ধারণা দৃঢ় হয়েছিল যে, বিয়ের জন্যে মেয়েদের প্রস্তুত হোতে হয় আত্মসম্মানকে পঙ্গু ক'রে, ন্যায়-অন্যায়বোধকে অসাড় করে দিয়ে।

এলা যখন ম্যাট্রিক্ পার হয়ে কলেজে প্রবেশ করেছে তখন মায়ের মৃত্যু হোলো। নরেশ মাঝে মাঝে বিয়ের প্রস্তাবে মেয়েকে রাজি করতে চেষ্টা করেছেন। এলা অপূর্ব্ব সুন্দরী, পাত্রের তরফে প্রার্থীর অভাব ছিল না, কিন্তু বিবাহের প্রতি বিমুখতা তার

সংস্কারগত। মেয়ে পরীক্ষাগুলো পাস করলে, তাকে অবিবাহিত রেখেই বাপ গেলেন মারা।

সুরেশ ছিল তাঁর কনিষ্ঠ ভাই। নরেশ এই ভাইকে মানুষ করেছেন, শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়েছেন খরচ দিয়ে। দুবছরের মতো তাকে বিলেতে পাঠিয়ে স্ত্রীর কাছে লাঞ্ছিত এবং মহাজনের কাছে ঋণী হয়েছেন। সুরেশ এখন ডাকবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। কর্ম্মউপলক্ষ্যে ঘুরতে হয় নানা প্রদেশে। তাঁরই উপর পড়ল এলার ভার। একান্ত যত্ন করেই ভার নিলেন।

সুরেশের স্ত্রীর নাম মাধবী। তিনি যে-পরিবারের মেয়ে সে-পরিবারে স্ত্রীলোকদের পরিমিত পড়া-শুনোই ছিল প্রচলিত; তার পরিমাণ মাঝারি মাপের চেয়ে কম বই বেশি নয়। স্বামী বিলেত থেকে ফিরে এসে উচ্চপদ নিয়ে দূরে দূরে যখন ঘুরতেন তখন তাঁকে বাইরের নানা লোকের সঙ্গে সামাজিকতা করতে হোতো। কিছুদিন অভ্যাসের পরে মাধবী নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে বিজাতীয় লৌকিকতা পালন করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। এমন কি, গোরাদের ক্লাবেও পঙ্গু ইংরেজি ভাষাকে সকারণ ও অকারণ হাসির দ্বারা পূরণ করে কাজ চালিয়ে আসতে পারতেন।

এমন সময় সুরেশ কোনো প্রদেশের বড়ো সহরে যখন আছেন এলা এলো তাঁর ঘরে; রূপে গুণে বিদ্যায় কাকার মনে গর্ব্ব জাগিয়ে তুললে। ওঁর উপরিওয়ালা বা সহকর্ম্মী এবং দেশী ও বিলিতি আলাপী পরিচিতদের কাছে নানা উপলক্ষ্যে এলাকে প্রকাশিত করবার জন্যে তিনি ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। এলার স্ত্রীবুদ্ধিতে বুঝতে বাকি রইল না যে, এর ফল ভালো হচ্চে না। মাধবী মিথ্যা আরামের ভান ক'রে ক্ষণে ক্ষণে বলতে লাগলেন, "বাঁচা গেল— বিলিতি কায়দার সামাজিকতার দায় আমার ঘাড়ে চাপানো কেন বাপু! আমার না আছে বিদ্যে, না আছে বুদ্ধি।" ভাবগতিক দেখে এলা নিজের চারিদিকে প্রায় একটা জেনানা খাড়া করে তুললে। সুরেশের মেয়ে সুরমার পড়াবার ভার সে অতিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গে নিলে। একটা থীসিস্ লিখতে লাগিয়ে দিলে তার বাকি সময়টুকু। বিষয়টা বাংলা মঙ্গলকাব্য ও চসারের কাব্যের তুলনা। এই নিয়ে সুরেশ মহা উৎসাহিত। এই সংবাদটা চারদিকে প্রচার করে দিলেন। মাধবী মুখ বাঁকা করে বললেন, "বাড়াবাড়ি!"

স্বামীকে বললেন, "এলার কাছে ফস্ করে

মেয়েকে পড়তে দিলে। কেন, অধর মাষ্টার কী দোষ করেছে? যাই বলোনা আমি কিন্তু—"

সুরেশ অবাক হয়ে বললেন, "কী বলো তুমি! এলার সঙ্গে অধরের তুলনা!"

"দুটো নোট বই মুখস্থ ক'রে পাস করলেই বিদ্যে হয় না,"—ব'লে ঘাড় বেঁকিয়ে গৃহিণী ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

একটা কথা স্বামীকে বলতেও তাঁর মুখে বাধে—"সুরমার বয়স তেরো পেরোতে চল্‌ল, আজ বাদে কাল পাত্র খুঁজতে দেশ ঝেঁটিয়ে বেড়াতে হবে, তখন এলা সুরমার কাছে থাকলে—ছেলেগুলোর চোখে যে ফ্যাকাসে কটা রঙের নেশা—ওরা কি জানে কাকে বলে সুন্দর?" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন আর ভাবেন,—এ সব কথা কর্ত্তাকে জানিয়ে ফল নেই, পুরুষরা যে সংসার-কাণা।—

যত শীঘ্র হয় এলার বিয়ে হয়ে যাক্ এই চেষ্টায় উঠে প'ড়ে লাগলেন গৃহিণী। বেশি চেষ্টা করতে হয় না, ভালো ভালো পাত্র আপনি এসে জোটে—এমন সব পাত্র, সুরমার সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ ঘটাবার জন্য মাধবী লুব্ধ হয়ে ওঠেন। অথচ এলা তাদের বারে বারে নিরাশ ক'রে ফিরিয়ে দেয়।

ভাইঝির একগুঁয়ে অবিবেচনায় উদ্বিগ্ন হলেন সুরেশ, কাকী হলেন অত্যন্ত অসহিষ্ণু। তিনি জানেন সৎপাত্রকে উপেক্ষা করা সমর্থ বয়সের বাঙালী মেয়ের পক্ষে অপরাধ। নানারকম বয়সোচিত দুর্য্যোগের আশঙ্কা করতে লাগলেন, এবং দায়িত্ববোধে অভিভূত হোলো তাঁর অন্তঃকরণ। এলা স্পষ্টই বুঝতে পারলে যে সে তার কাকার স্নেহের সঙ্গে কাকার সংসারের দ্বন্দ্ব ঘটাতে বসেছে।

এমন সময়ে ইন্দ্রনাথ এলেন সেই সহরে। দেশের ছাত্রেরা তাঁকে মান্‌ত রাজচক্রবর্ত্তীর মতো। অসাধারণ তাঁর তেজ, আর বিদ্যার খ্যাতিও প্রভূত। একদিন সুরেশের ওখানে তাঁর নিমন্ত্রণ। সেদিন কোনো এক সুযোগে এলা অপরিচয়সত্ত্বেও অসঙ্কোচে তাঁর কাছে এসে বল্‌লে, “আমাকে আপনার কোনো একটা কাজ দিতে পারেন না?”

আজকালকার দিনে এ রকম আবেদন বিশেষ আশ্চর্য্যের নয় কিন্তু তবু মেয়েটির দীপ্তি দেখে চমক লাগ্‌ল ইন্দ্রনাথের। তিনি বল্‌লেন, “কলকাতায় সম্প্রতি নারায়ণী হাইস্কুল মেয়েদের জন্যে খোলা হয়েছে। তোমাকে তার কর্ত্রীপদ দিতে পারি, প্রস্তুত আছ?”

"প্রস্তুত আছি যদি আমাকে বিশ্বাস করেন।"

ইন্দ্রনাথ এলার মুখের দিকে তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টি রেখে বল্‌লেন, "আমি লোক চিনি। তোমাকে বিশ্বাস কর্‌তে আমার মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব হয়নি। তোমাকে দেখবামাত্রই মনে হয়েছে, তুমি নবযুগের দূতী, নবযুগের আহ্বান তোমার মধ্যে।"

হঠাৎ ইন্দ্রনাথের মুখে এমন কথা শুনে এলার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠ্‌ল।

সে বললে, "আপনার কথায় আমার ভয় হয়। ভুল ক'রে আমাকে বাড়াবেন না। আপনার ধারণার যোগ্য হবার জন্যে দুঃসাধ্য চেষ্টা করতে গেলে ভেঙে পড়ব। আমার শক্তির সীমার মধ্যে যতটা পারি বাঁচিয়ে চল্‌ব আপনার আদর্শ, কিন্তু ভান করতে পারব না।"

ইন্দ্রনাথ বল্‌লেন, "সংসারের বন্ধনে কোনোদিন বদ্ধ হবে না এই প্রতিজ্ঞা তোমাকে স্বীকার করতে হবে। তুমি সমাজের নও তুমি দেশের।"

এলা মাথা তুলে বল্‌লে, "এই প্রতিজ্ঞাই আমার।"

কাকা গমনোদ্যত এলাকে বল্‌লেন "তোকে আর কোনোদিন বিয়ের কথা বল্‌ব না। তুই আমার কাছেই থাক্। এখানেই পাড়ার মেয়েদের পড়াবার

ভার নিয়ে একটা ছোটোখাটো ক্লাস খুল্‌লে দোষ কী!"

কাকী স্নেহার্দ্র স্বামীর অবিবেচনায় বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন,"ওর বয়স হয়েছে, ও নিজের দায় নিজেই নিতে চায়, সে ভালোই তো। তুমি কেন বাধা দিতে যাও মাঝের থেকে! তুমি যাই মনে করোনা কেন, আমি ব'লে রাখছি ওর ভাবনা আমি ভাবতে পার্‌ব না।"

এলা খুব জোর করেই বল্‌লে—"আমি কাজ পেয়েছি, কাজ করতেই যাব।"

এলা কাজ করতেই গেল।

এই ভূমিকার পরে পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হোলো, এখন কাহিনী অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

দৃশ্য—চায়ের দোকান। তারি এক পাশে একটি ছোটো ঘর। সেই ঘরে বিক্রির জন্যে সাজানো কিছু স্কুল-কালেজপাঠ্য বই, অনেকগুলিই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড। কিছু আছে য়ুরোপীয় আধুনিক গল্প নাটকের ইংরেজি তর্জ্জমা। সেগুলো অল্পবিত্ত ছেলেরা পাত উল্‌টিয়ে প'ড়ে চলে যায়, দোকানদার আপত্তি করে না। স্বত্বাধিকারী কানাই গুপ্ত, পুলিসের পেন্সনভোগী সাবেক সাব্-ইন্‌স্পেক্টর।

সামনে সদর রাস্তা, বাঁ পাশ দিয়ে গেছে গলি। যারা নিভৃতে চা খেতে চায় তাদের জন্যে ঘরের এক অংশ ছিন্নপ্রায় চটের পর্দ্দা দিয়ে ভাগ করা। আজ সেইদিকটাতে একটা বিশেষ আয়োজনের লক্ষণ। যথেষ্ট পরিমাণ টুল চৌকির অসদ্ভাব পূরণ করেছে দার্জ্জিলিং চা কোম্পানির মার্কা-মারা প্যাকবাক্স। চায়ের পাত্রেও অগত্যা বৈসাদৃশ্য, তাদের কতকগুলি নীলরঙের এনামেলের, কতকগুলি সাদা চীনামাটির। টেবিলে হাতল-ভাঙা দুধের জগে ফুলের তোড়া। বেলা প্রায় তিনটে। ছেলেরা এলালতাকে নিমন্ত্রণের সময় নির্দ্দেশ ক'রে

দিয়েছিল ঠিক আড়াইটায়। বলেছিল এক মিনিট পিছিয়ে এলে চল্‌বে না। অসময়ে নিমন্ত্রণ, যেহেতু ঐ সময়টাতেই দোকান শূন্য থাকে। চা-পিপাসুর ভিড় লাগে সাড়ে চারটার পর থেকে। এলা ঠিক সময়েই উপস্থিত। কোথাও ছেলেদের একজনেরও দেখা নেই। একলা ব'সে তাই ভাব্‌ছিল—তবে কি শুন্‌তে তারিখের ভুল হয়েছে! এমন সময় ইন্দ্রনাথকে ঘরে ঢুক্‌তে দেখে চম্‌কে উঠ্‌ল। এ জায়গায় তাঁকে কোনোমতেই আশা করা যায় না।

ইন্দ্রনাথ য়ুরোপে কাটিয়েছেন অনেকদিন, বিশেষ খ্যাতি পেয়েছেন সায়ান্সে। যথেষ্ট উঁচুপদে প্রবেশের অধিকার তাঁর ছিল ; য়ুরোপীয় অধ্যাপকদের প্রশংসাপত্র ছিল উদার ভাষায়। য়ুরোপে থাকতে ভারতীয় কোনো একজন পোলিটিক্যাল্ বদ্‌নামীর সঙ্গে তাঁর কদাচিৎ দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল, দেশে ফিরে এলে তারি লাঞ্ছনা তাঁকে সকল কর্ম্মে বাধা দিতে লাগল। অবশেষে ইংলণ্ডের খ্যাতনামা কোনো বিজ্ঞান-আচার্য্যের বিশেষ সুপারিসে অধ্যাপনার কাজ পেয়েছিলেন, কিন্তু সে কাজ অযোগ্য অধিনায়কের অধীনে। অযোগ্যতার সঙ্গে ঈর্ষ্যা থাকে প্রখর, তাই তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার

চেষ্টা উপরওয়ালার হাত থেকে ব্যাঘাত পেতে লাগল পদে পদে। শেষে এমন জায়গায় তাঁকে বদলি হোতে হোলো যেখানে ল্যাবরেটরি নেই। বুঝতে পারলেন এদেশে তাঁর জীবনে সর্ব্বোচ্চ অধ্যবসায়ের পথ অবরুদ্ধ। একই প্রদক্ষিণপথে অধ্যাপনার চিরাভ্যস্ত চাকা ঘুরিয়ে অবশেষে কিঞ্চিৎ পেন্সন ভোগ ক'রে জীবলীলা সম্বরণ করবেন, নিজের এই দুর্গতির আশঙ্কা তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে পারলেন না। তিনি নিশ্চিত জানতেন অন্য যে-কোনো দেশে সম্মানলাভের শক্তি তাঁর প্রচুর ছিল।

একদা ইন্দ্রনাথ জার্ম্মান ফরাসী ভাষা শেখাবার একটা প্রাইভেট ক্লাস খুললেন, সেই সঙ্গে ভার নিলেন বটানি ও জিয়লজিতে কলেজের ছাত্রদের সাহায্য করবার। ক্রমে এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের গোপন তলদেশ বেয়ে একটা অপ্রকাশ্য সাধনার জটিল শিকড় জেল-খানার প্রাঙ্গণের মাঝখান দিয়ে ছড়িয়ে পড়্‌ল বহুদূরে।

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন,"এলা, তুমি যে এখানে?"

এলা বল্‌লে, "আপনি আমার বাড়িতে ওদের যাওয়া নিষেধ করেছেন সেইজন্যে ছেলেরা এখানেই আমাকে ডেকেছে।"

"সে খবর আগেই পেয়েছি। পেয়েই জরুর তাদের অন্যত্র কাজে লাগিয়ে দিলুম। ওদের সকলের হয়ে এপলজি করতে এসেছি। বিলও শোধ করে দেব।"

"কেন আপনি আমার নিমন্ত্রণ ভেঙে দিলেন ?"

"ছেলেদের সঙ্গে তোমার সহৃদয়তার সম্পর্ক আছে সেই কথাটা চাপা দেবার জন্যে। কাল দেখতে পাবে তোমার নাম ক'রে একটা প্রবন্ধ কাগজে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"আপনি লিখেছেন ? আপনার কলমে বেনামী চলে না; লোকে ওটাকে অকৃত্রিম ব'লে বিশ্বাস করবে না।"

"বাঁ হাত দিয়ে কাঁচা ক'রে লেখা; বুদ্ধির পরিচয় নেই, সদুপদেশ আছে।"

"কী রকম ?"

"তুমি লিখ্‌ছ,—ছেলেরা অকালবোধনে দেশকে মারতে বসেছে। বঙ্গনারীদের কাছে তোমার সকরুণ আপিল এই যে, তারা যেন লক্ষ্মীছাড়াদের মাথা ঠাণ্ডা করে। বলেছ,—দূর থেকে ভর্ৎসনা কর্‌লে কানে পৌঁছবে না। ওদের মাঝখানে গিয়ে পড়তে হবে, যেখানে ওদের নেশার আড্ডা। শাসনকর্ত্তাদের সন্দেহ হোতে

পারে, তা হোক্। বলেছ,—তোমরা মায়ের জাত; ওদের শাস্তি নিজে নিয়েও যদি ওদের বাঁচাতে পারো, মরণ সার্থক হবে। আজকাল সর্ব্বদাই ব'লে থাকো—তোমরা মায়ের জাত, ঐ কথাটাকে লবণাম্বুতে ভিজিয়ে লেখার মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি। মাতৃবৎসল পাঠকের চোখে জল আসবে। যদি তুমি পুরুষ হোতে, এর পরে রায় বাহাদুর পদবী পাওয়া অসম্ভব হোতো না।"

"আপনি যা লিখেছেন সেটা যে একেবারেই আমার কথা হোতে পারে না তা আমি বল্‌ব না। এই সর্ব্ব-নেশে ছেলেগুলোকে আমি ভালোবাসি—অমন ছেলে আছে কোথায়! একদিন ওদের সঙ্গে কলেজে পড়েছি। প্রথম প্রথম ওরা আমার নামে বোর্ডে লিখেছে যা-তা,—পিছন থেকে ছোটো এলাচ ব'লে চেঁচিয়ে ডেকেই ভালোমানুষের মতো আকাশের দিকে তাকিয়েছে। ফোর্থ্ ইয়ারে পড়্‌ত আমার বন্ধু ইন্দ্রাণী—তাকে বল্‌ত বড়ো এলাচ, সে বেচারার বহরে কিছু বাহুল্য ছিল. রঙটাও উজ্জ্বল ছিল না। এই সব ছোটোখাটো উৎপাত নিয়ে অনেক মেয়ে রাগারাগি কর্‌ত, আমি কিন্তু ছেলেদের পক্ষ নিয়েছি। আমি জানতুম, আমরা

ওদের চোখে অনভ্যস্ত তাই ওদের ব্যবহারটা হয়ে পড়ে এলোমেলো—কদর্য্যও হয় কখনো কখনো, কিন্তু সেটা ওদের স্বাভাবিক নয়। যখন অভ্যেস হয়ে গেল, সুর আপনি এল সহজ হয়ে। ছোটো এলাচ হোলো এলা-দি। মাঝে মাঝে কারো সুরে মধুর রস লেগেছে —কেনই বা লাগ্‌বে না? আমি কখনো ভয় করিনি তা নিয়ে। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি ছেলেদের সঙ্গে ব্যবহার করা খুবই সহজ, মেয়েরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যদি ওদের মৃগয়া করবার দিকে ঝোঁক না দেয়। তার পরে একে একে দেখলুম ওদের মধ্যে সব চেয়ে ভালো যারা, যাদের ইতরতা নেই, মেয়েদের 'পরে সম্মান যাদের পুরুষের যোগ্য—"

"অর্থাৎ কলকাতার রসিক ছেলেদের মতো যাদের রস গাঁজিয়ে-ওঠা নয়—"

"হাঁ তারাই, ছুট্‌ল মৃত্যুদূতের পিছন পিছন মরীয়া হয়ে, তারা প্রায় সবাই আমারই মতো বাঙাল। ওরাই যদি মর্‌তে ছোটে আমি চাইনে ঘরের কোণে বেঁচে থাকতে। কিন্তু দেখুন মাষ্টারমশায়, সত্যি কথা বল্‌ব। যতই দিন যাচ্চে, আমাদের উদ্দেশ্যটা উদ্দেশ্য না হয়ে নেশা হয়ে উঠছে। আমাদের কাজের পদ্ধতি

চলেছে যেন নিজের বেতালা ঝোঁকে বিচারশক্তির বাইরে। ভালো লাগ্‌ছে না। অমন সব ছেলেদের কোন্ অন্ধশক্তির কাছে বলি দেওয়া হচ্চে! আমার বুক ফেটে যায়।"

"বৎসে, এই যে ধিক্কার এটাই কুরুক্ষেত্রের উপক্রমণিকা। অর্জ্জুনের মনেও ক্ষোভ জেগেছিল। ডাক্তারি শেখবার গোড়ায় মড়া কাটবার সময় ঘৃণায় প্রায় মূর্চ্ছা গিয়েছিলুম। ঐ ঘৃণাটাই ঘৃণ্য। শক্তির গোড়ায় নিষ্ঠুরের সাধনা, শেষে হয়তো ক্ষমা। তোমরা ব'লে থাকো—মেয়েরা মায়ের জাত, কথাটা গৌরবের নয়। মা তো প্রকৃতির হাতে স্বতই বানানো। জন্তু জানোয়াররাও বাদ যায় না। তার চেয়ে বড়ো কথা তোমরা শক্তিরূপিণী, এইটেকেই প্রমাণ করতে হবে দয়া-মায়ার জলা-জমি পেরিয়ে গিয়ে শক্ত ডাঙায়। শক্তি দাও, পুরুষকে শক্তি দাও।"

"এ সব মস্ত কথা ব'লে আপনি ভোলাচ্চেন আমাদের। আমরা আসলে যা, তার চেয়ে দাবী করছেন অনেক বেশি। এতটা সইবে না।"

"দাবীর জোরেই দাবী সত্য হয়। তোমাদের আমরা যা বিশ্বাস করতে থাকব তোমরা তাই হয়ে

উঠবে। তোমরাও তেমনি ক'রে আমাদের বিশ্বাস করো যাতে আমাদের সাধনা সত্য হয়।"

"আপনাকে কথা কওয়াতে ভালোবাসি কিন্তু এখন সে নয়। আমি নিজে কিছু বল্‌তে ইচ্ছে করি।"

"আচ্ছা। তা হোলে এখানে নয়, চলো ঐ পিছনের ঘরটাতে।"

পর্দ্দাটানা আধা অন্ধকার ঘরে গেল ওরা। সেখানে একখানা পুরোনো টেবিল, তার দুধারে দুখানা বেঞ্চ, দেয়ালে একটা বড়ো সাইজের ভারতবর্ষের ম্যাপ।

"আপনি একটা অন্যায় করছেন—একথা না ব'লে থাকতে পারলুম না।"

ইন্দ্রনাথকে এমন ক'রে বল্‌তে একমাত্র এলাই পারে। তবু তার পক্ষেও বলা সহজ নয়, তাই অস্বাভাবিক জোর লাগ্‌ল গলায়।

ইন্দ্রনাথকে ভালো দেখতে বল্‌লে সবটা বলা হয় না। ওর চেহারায় আছে একটা কঠিন আকর্ষণ-শক্তি। যেন একটা বজ্র বাঁধা আছে সুদূরে ওর অন্তরে, তার গর্জ্জন কানে আসে না, তার নিষ্ঠুর দীপ্তি মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে পড়ে। মুখের ভাবে মাজা-ঘষা ভদ্রতা, শান-দেওয়া ছুরির মতো। কড়া কথা বল্‌তে বাধে

না কিন্তু হেসে বলে; গলার সুর রাগের বেগেও চড়ে না, রাগ প্রকাশ পায় হাসিতে। যতটুকু পরিচ্ছন্নতায় মর্য্যাদা রক্ষা হয় ততটুকু কখনো ভোলে না এবং অতিক্রমও করে না। চুল অনতিপরিমাণে ছাঁটা, যত্ন না করলেও এলোমেলো হবার আশঙ্কা নেই। মুখের রঙ বাদামী, লালের আভাস দেওয়া।—ভুরুর উপর দুইপাশে প্রশস্ত টানা কপাল, দৃষ্টিতে কঠিন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ঠোঁটে অবিচলিত সংকল্প এবং প্রভুত্বের গৌরব। অত্যন্ত দুঃসাধ্য রকমের দাবী সে অনায়াসে করতে পারে, জানে সেই দাবী সহজে অগ্রাহ্য হবে না। কেউ জানে তার বুদ্ধি অসামান্য, কেউ জানে তার শক্তি অলৌকিক। তার 'পরে কারো আছে সীমাহীন শ্রদ্ধা, কারো আছে অকারণ ভয়।

ইন্দ্রনাথ হাসিমুখে বল্‌লে, "কী অন্যায়?"

"আপনি উমাকে বিয়ে করতে হুকুম করেছেন, সে তো বিয়ে করতে চায় না।"

"কে বল্‌লে, চায় না?"

"সে নিজেই বলে।"

"হয়তো সে নিজে ঠিক জানে না, কিম্বা নিজে ঠিক বলে না।"

“সে আপনার সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল বিয়ে করবে না।”

“তখন সেটা ছিল সত্য, এখন সেটা সত্য নেই। মুখের কথায় সত্য সৃষ্টি করা যায় না। প্রতিজ্ঞা উমা আপনিই ভাঙত, আমি ভাঙালুম, ওর অপরাধ বাঁচিয়ে দিলুম।”

“প্রতিজ্ঞা রাখা না রাখার দায়িত্ব ওরই, না হয় ভাঙত, না হয় করত অপরাধ।”

“ভাঙতে ভাঙতে আশেপাশে ভাঙচুর করত বিস্তর, লোকসান হোতো আমাদের সকলেরই।”

“ও কিন্তু বড়ো কান্নাকাটি করছে।”

“তাহোলে কান্নাকাটির দিন আর বাড়তে দেব না— কাল পরশুর মধ্যেই বিয়ে চুকিয়ে দেওয়া যাবে।”

“কাল পরশুর পরেও তো ওর সমস্ত জীবনটাই আছে।”

“মেয়েদের বিয়ের আগেকার কান্না প্রভাতে মেঘডম্বরং।”

“আপনি নিষ্ঠুর!”

“কেন না, মানুষকে যে-বিধাতা ভালোবাসেন তিনি নিষ্ঠুর, জন্তুকেই তিনি প্রশ্রয় দেন।”

"আপনি জানেন উমা সুকুমারকে ভালোবাসে।"

"সেই জন্যেই ওকে তফাৎ করতে চাই।"

"ভালোবাসার শাস্তি ?"

"ভালোবাসার শাস্তির কোনো মানে নেই। তা হোলে বসন্ত রোগ হয়েছে ব'লেও শাস্তি দিতে হয়। কিন্তু গুটি বেরোলে ঘর থেকে বের ক'রে রোগীকে হাঁসপাতালে পাঠানোই শ্রেয়।"

"সুকুমারের সঙ্গে বিয়ে দিলেই তো হয়।"

"সুকুমার তো কোনো অপরাধ করেনি। ওর মতো ছেলে আমাদের মধ্যে ক-জন আছে ?"

"ও যদি নিজেই উমাকে বিয়ে করতে রাজি হয় ?"

"অসম্ভব নয়। সেই জন্যেই এত তাড়া। ওর মতো উঁচুদরের পুরুষের মনে বিভ্রম ঘটানো মেয়েদের পক্ষে সহজ ;—সৌজন্যকে প্রশ্রয় ব'লে সুকুমারের কাছে প্রমাণ করা দুই এক ফোঁটা চোখের জলেই সম্ভব হোতে পারে। রাগ কর্‌ছ শুনে ?"

"রাগ কর্‌ব কেন ? মেয়েরা নিঃশব্দ নৈপুণ্যে প্রশ্রয় ঘটিয়েছে আর তার দায় মানতে হয়েছে পুরুষকে, আমার অভিজ্ঞতায় এমন ঘটনার অভাব নেই। সময় হয়েছে সত্যের অনুরোধে ন্যায় বিচার করবার। আমি

সেটা ক'রে থাকি ব'লেই মেয়েরা আমাকে দেখ্‌তে পারে না। যার সঙ্গে উমার বিয়ের হুকুম সেই ভোগীলালের মত কী ?"

"সেই নিষ্কণ্টক ভালোমানুষের মতামত ব'লে কোনো উপসর্গ নেই। বাঙালীর মেয়েমাত্রকেই সে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি ব'লে জানে। ও-রকম মুগ্ধ স্বভাবের ছেলেকে দলের বাইরের আঙিনায় সরিয়ে ফেলা দরকার। জঞ্জাল ফেলবার সব চেয়ে ভালো ঝুড়ি বিবাহ।"

"এই সমস্ত উৎপাতের আশঙ্কা সত্ত্বেও আপনি মেয়ে পুরুষকে একত্র করেছেন কেন ?"

"শরীরটাতে ছাই দিয়েছে যে-সন্ন্যাসী, আর প্রবৃত্তিকে ছাই করেছে যে-ভস্মকুণ্ড সেই ক্লীবদের নিয়ে কাজ হবে না ব'লে। যখন দেখ্‌ব আমাদের দলের কোনো অগ্নি-উপাসক অসাবধানে নিজের মধ্যেই অগ্নিকাণ্ড করতে বসেছে,—দেব তাদের সরিয়ে। আমাদের অগ্নিকাণ্ড দেশ জুড়ে', নেবানো মন দিয়ে তা হবে না, আর হবে না তাদের দিয়ে—আগুন যারা চাপ্‌তে জানে না।"

গম্ভীর মুখে এলা বসে রইল। কিছুক্ষণ বাদে চোখ নামিয়ে বল্‌লে, "আমাকে আপনি তবে ছেড়ে দিন্।"

"এতখানি ক্ষতি করতে বলো কেন ?"

"আপনি জানেন না।"

"জানিনে কে বল্‌লে ? দেখা গেল একদিন তোমার খদ্দরে একটুখানি রং লেগেছে। জানা গেল অন্তরে অরুণোদয়। বুঝতে পারি একটা কোন্ পায়ের শব্দের প্রত্যাশায় তোমার কান পাতা থাকে। গেল শুক্রবারে যখন এলুম তোমার ঘরে, তুমি ভেবেছিলে আর কেউ-বা। দেখলুম মনটা ঠিক করে নিতে কিছু সময় লাগল। লজ্জা কোরো না তুমি, এতে অসঙ্গত কিছুই নেই।"

কর্ণমূল লাল করে চুপ করে রইল এলা।

ইন্দ্রনাথ বল্‌লে, "তুমি একজনকে ভালোবেসেছ, এই তো ? তোমার মন তো জড় পাষাণে গড়া নয়। যাকে ভালোবাসো তাকেও জানি। অনুশোচনার কারণ কিছুই দেখছি নে।"

"আপনি বলেছিলেন একমনা হয়ে কাজ করতে হবে। সকল অবস্থায় তা সম্ভব না হোতে পারে।"

"সকলের পক্ষে নয়। কিন্তু ভালোবাসার গুরু-ভারে তোমার ব্রত ডোবাতে পারে তুমি তেমন মেয়ে নও।"

"কিন্তু—"

"এর মধ্যে কিন্তু কিছুই নেই—তুমি কিছুতেই নিষ্কৃতি পাবে না।"

"আমি তো আপনাদের কোনো কাজে লাগিনে, সে আপনি জানেন।"

"তোমার কাছ থেকে কাজ চাইনে, কাজের কথা সব জানাইওনে তোমাকে। কেমন ক'রে তুমি নিজে বুঝবে তোমার হাতের রক্তচন্দনের ফোঁটা ছেলেদের মনে কী আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সেটুকু বাদ দিয়ে কেবল শুখো মাইনেয় কাজ করাতে গেলে পূরো কাজ পাব না। আমরা কামিনীকাঞ্চনত্যাগী নই। যেখানে কাঞ্চনের প্রভাব সেখানে কাঞ্চনকে অবজ্ঞা করিনে, যেখানে কামিনীর প্রভাব সেখানে কামিনীকে বেদীতে বসিয়েছি।"

"আপনার কাছে মিথ্যে বল্‌ব না, বুঝ্‌তে পার্‌ছি আমার ভালোবাসা দিনে দিনেই আমার অন্য সকল ভালোবাসাকে ছাড়িয়ে যাচ্চে।"

"কোনো ভয় নেই, খুব ভালোবাসো। শুধু মা মা স্বরে দেশকে যারা ডাকাডাকি করে, তারা চিরশিশু। দেশ বৃদ্ধ শিশুদের মা নয়, দেশ অর্দ্ধনারীশ্বর—মেয়ে

পুরুষের মিলনে তার উপলব্ধি। এই মিলনকে নিস্তেজ কোরো না সংসার-পিঁজ্‌রেয় বেঁধে।”

“কিন্তু তবে আপনি যে ঐ উমা—”

“উমা! কালু!—ভালোবাসার শুষ্ক রুদ্ররূপ ওরা সইতে পার্‌বে কী ক’রে? যে দাম্পত্যের ঘাটে ওদের সকল সাধনার অন্ত্যেষ্টি সৎকার, সময় থাক্‌তে সেখানেই দুজনকে গঙ্গাযাত্রায় পাঠাচ্চি।—সে কথা থাক্। শোনা গেল তোমার ঘরে ডাকাত ঢুকেছিল পর্শু রাত্রে।”

“হাঁ, ঢুকেছিল।”

“তোমার জুজুৎসু শিক্ষায় ফল পেয়েছিলে কি?”

“আমার বিশ্বাস ডাকাতের কব্‌জি দিয়েছি ভেঙে।”

“মনটার ভিতর আহা উহু ক’রে ওঠেনি?”

“কর্‌ত কিন্তু ভয় ছিল ও আমাকে অপমান করবে। ও যদি যন্ত্রণায় হার মান্‌ত আমি শেষ পর্য্যন্ত মোচড় দিতে পার্‌তুম না।”

“চিন্‌তে পেরেছিলে সে কে?”

“অন্ধকারে দেখ্‌তে পাইনি।”

“যদি পেতে তা হোলে জান্‌তে, সে অনাদি।”

“আহা সে কী কথা! আমাদের অনাদি! সে যে ছেলেমানুষ!”

"আমিই তাকে পাঠিয়েছিলুম।"

"আপনিই! কেন এমন কাজ করলেন?"

"তোমারো পরীক্ষা হোলো, তারো!"

"কী নিষ্ঠুর!"

"ছিলুম নীচের ঘরে, তখনি হাড় ঠিক করে দিয়েছি। তুমি নিজেকে মনে করো ব্যথাকাতর। বোঝাতে চেয়েছিলুম বিপদের মুখে কাতরতা স্বাভাবিক নয়। সেদিন তোমাকে বললুম, ছাগল ছানাটাকে পিস্তল ক'রে মারতে। তুমি বললে, কিছুতেই পারবে না। তোমার পিস্‌তুত বোন বাহাদুরী ক'রে মারলে গুলি। যখন দেখলে জন্তুটা পা ভেঙে পড়ে গেল, কাঠিন্যের ভান ক'রে হা হা ক'রে হেসে উঠল। হিস্‌টীরিয়ার হাসি, সেদিন রাত্তিরে তার ঘুম হয়নি। কিন্তু তোমাকে যদি বাঘে খেতে আসত আর তুমি যদি ভীতু না হোতে তা হোলে তখনি তাকে মারতে, দ্বিধা করতে না। আমরা সেই বাঘটাকে মনের সামনে স্পষ্ট দেখছি, দয়ামায়া দিয়েছি বিসর্জ্জন, নইলে নিজেকে সেন্টিমেণ্টাল ব'লে ঘৃণা করতুম। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই কথাটাই বুঝিয়েছিলেন। নির্দ্দয় হবে না কিন্তু কর্ত্তব্যের বেলা নির্ম্মম হোতে হবে। বুঝতে পেরেছ?"

"পেরেছি।"

"যদি বুঝে থাকো একটা প্রশ্ন কর্‌ব। তুমি অতীনকে ভালোবাসো?"

কোনো উত্তর না দিয়ে এলা চুপ করে রইল। "যদি কখনো সে আমাদের সকলকে বিপদে ফেলে, তাকে নিজের হাতে মার্‌তে পারো না?"

"তারপক্ষে এতই অসম্ভব যে হাঁ বল্‌তে আমার মুখে বাধ্‌বে না।"

"যদিই সম্ভব হয়?"

"মুখে যা-ই বলি না কেন, নিজেকে কি শেষ পর্য্যন্ত জানি?"

"জানতেই হবে নিজেকে। সমস্ত নিদারুণ সম্ভাবনা প্রত্যহ কল্পনা ক'রে নিজেকে প্রস্তুত রাখ্‌তে হবে।"

"আমি নিশ্চিত বল্‌ছি, আপনি আমাকে ভুল করে বেছে নিয়েছেন।"

"আমি নিশ্চিত জানি আমি ভুল করিনি।"

"মাষ্টারমশায়, আপনার পায়ে পড়ি, দিন্‌ অতীনকে নিষ্কৃতি।"

"আমি নিষ্কৃতি দেবার কে? ও বাঁধা পড়েছে নিজেরই সঙ্কল্পের বন্ধনে। ওর মন থেকে দ্বিধা কোনো

কালেই মিট্‌বে না, রুচিতে ঘা লাগ্‌বে প্রতিমুহূর্ত্তে, তবু ওর আত্মসম্মান ওকে নিয়ে যাবে শেষ পর্য্যন্ত।"

"লোক চিন্‌তে আপনি কি কখনো ভুল করেন না?"

"করি। অনেক মানুষ আছে যাদের স্বভাবে দু-রকম বুনোনির কাজ। দুটোর মধ্যে মিল নেই। অথচ দুটোই সত্য। তারা নিজেকেও নিজে ভুল করে।"

ভারী গলায় আওয়াজ এলো, "কী হে ভায়া।"

"কানাই বুঝি? এসো এসো।"

কানাইগুপ্ত এলো ঘরে। বেঁটে মোটা মানুষটি আধবুড়ো। সপ্তাহখানেক দাড়ি গোঁফ কামাবার অবকাশ ছিল না, কণ্টকিত হয়ে উঠেছে মুখমণ্ডল। সামনের মাথায় টাক; ধুতির উপর মোটা খদ্দরের চাদর, ধোবার প্রসাদ-বঞ্চিত, জামা নেই। হাত দুটো দেহের পরিমাণে খাটো, মনে হয়, সর্ব্বদা কাজে উদ্যত, দলের লোকের যথাসম্ভব অন্নসংস্থানের জন্যই কানাইয়ের চায়ের দোকান।

কানাই তার স্বাভাবিক চাপা ভাঙা গলায় বল্‌লে, "ভায়া, তোমার খ্যাতি আছে বাক্‌সংযমে, তুমি মুনি বল্‌লেই হয়। এলাদি তোমার সেই খ্যাতি বুঝি দিলে মাটি ক'রে।"

ইন্দ্রনাথ হেসে বল্‌লে, “কথা না বলারই সাধনা আমাদের। নিয়মটাকে রক্ষা করবার জন্যেই ব্যতি-ক্রমের দরকার। এই মেয়েটি নিজে কথা বলে না, অন্যকে কথা বলবার ফাঁক দেয়, বাক্যের ’পরে এ একটি বহুমূল্য আতিথ্য।”

“কী বলো তুমি ভায়া! এলাদি কথা বলে না! তোমার কাছে চুপ, কিন্তু যেখানে মুখ খোলে সেখানে বাণীর বন্যা। আমি তো মাথাপাকা মানুষ, সাড়া পেলেই খাতাপত্র ফেলে আড়াল থেকে ওর কথা শুন্‌তে আসি। এখন আমার প্রতি একটু মনোযোগ দিতে হবে। এলাদির মতো কণ্ঠ নয় আমার, কিন্তু সংক্ষেপে যেটুকু বল্‌ব তা মর্ম্মে প্রবেশ কর্‌বে।”

এলা তাড়াতাড়ি উঠে পড়্‌ল। ইন্দ্রনাথ বল্‌লে—“যাবার আগে একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি। দলের লোকের কাছে আমি তোমাকে নিন্দে ক’রে থাকি। এমন কি, এমন কথাও বলেছি, যে, একদিন তোমাকে হয় তো একেবারে নিশ্চিহ্ন সরিয়ে দিতে হবে। বলেছি, অতীনকে তুমি ভাঙিয়ে নিচ্চ, সেই ভাঙনে আরো কিছু ভাঙ্‌বে।”

“বল্‌তে বল্‌তে কথাটাকে সত্য ক’রে তুল্‌ছেন কেন?

কী জানি, এখানকার সঙ্গে হয় তো আমার একটা অসামঞ্জস্য আছে।”

“থাকা সত্ত্বেও তোমাকে সন্দেহ করিনে। কিন্তু তবু ওদের কাছে তোমার নিন্দে করি। তোমার শত্রু কেউ নেই এই জনপ্রবাদ, কিন্তু দেখ্‌তে পাই তোমার বারো আনা অনুরক্তের বাংলাদেশী মন নিন্দা বিশ্বাস করবার আগ্রহে লালায়িত হয়ে ওঠে। এই নিন্দাবিলাসীরা নিষ্ঠাহীন। এদের নাম খাতায় টুঁকে রাখি। অনেক-গুলো পাতা ভরতি হোলো।”

“মাষ্টারমশায়, ওরা নিন্দে ভালোবাসে ব'লেই নিন্দে করে, আমার উপর রাগ আছে ব'লে নয়।”

“অজাতশত্রু নাম শুনেছ এলা। এরা সবাই জাতশত্রু। জন্মকাল থেকেই এদের অহৈতুক শত্রুতা বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের সমস্ত চেষ্টাকে কেবলি ধূলিসাৎ কর্‌ছে।”

“ভায়া, আজ এই পর্য্যন্ত, বিষয়টা আগামীবারে সমাপ্য। এলাদি, তোমার চায়ের নিমন্ত্রণ ভাঙবার মূলে যদি গোপনে আমি থাকি, কিছু মনে কোরো না। আমার চায়ের দোকানটাতে কুলুপ পড়বার সময় আসন্ন। বোধ হয় মাইল শো তিন তফাতে গিয়ে

এবার নাপিতের দোকান খুল্‌তে হবে। ইতিমধ্যে অলকানন্দা তৈল পাঁচ পিপে তৈরি করে রেখেছি। মহাদেবের জটা নিংড়ে বের করা। একটা সার্টিফিকেট দিয়ো বৎসে, বোলো—অলকা তেল মাথার পর থেকে চুল-বাঁধা একটা আপদ হয়েছে, দীর্ঘায়মানা বেণী সাম্‌লে তোলা স্বয়ং দশভুজা দেবীর দুঃসাধ্য।"

যাবার সময় এলা দরজার কাছে এসে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে,—"মাষ্টারমশায়, মনে রইল আপনার কথা, প্রস্তুত থাক্‌ব। আমাকে সরাবার দিন হয়তো আস্‌বে, নিঃশব্দেই মিলিয়ে যাব।"

এলা চলে গেলে ইন্দ্রনাথ বল্‌লে, "তোমাকে চঞ্চল দেখ্‌ছি কেন হে, কানাই?"

"সম্প্রতি রাস্তার ধারে আমার ঐ সামনের টেবিলেই ব'সে গোটাতিনেক গুণ্ডা ছেলে বীররস প্রচার কর্‌ছিল। আওয়াজে বোঝা যায় জন্ বৃষভেরই পুষ্যি বাছুর। আমি সিডিশনের নমুনা সুদ্ধ ওদের নামে পুলিসে রিপোর্ট করে দিয়েছি।"

"আন্দাজ করতে ভুল করোনি তো কানাই?"

"বরং ভুল ক'রে সন্দেহ করা ভালো, কিন্তু সন্দেহ না ক'রে ভুল করা সাংঘাতিক। খাঁটি বোকাই যদি

হয় তাহোলে কেউ ওদের বাঁচাতে পারবে না, আর যদি হয় খাঁটি দুষ্‌মন্‌ তাহোলে ওদের মার্‌বে কে? আমার রিপোর্টে উন্নতিই হবে। সেদিন চড়া গলায় সয়তানি শাসনপ্রণালীর উপর দিয়ে রক্তগঙ্গা বওয়াবার প্রস্তাব তুলেছিল। নিশ্চয়ই অভয়চরণ রক্ষিত এদের উপাধি। একদিন সন্ধ্যাবেলায় ক্যাশ বাক্স নিয়ে হিসেব মেলাতে বসেছিলুম। হঠাৎ একটা ধুলোমাখা ছেঁড়াকাপড়-পরা ছেলে এসে চুপি চুপি বল্‌লে, টাকা চাই পঁচিশটা, যেতে হবে দিনাজপুরে। আমাদের মথুর মামার নাম কর্‌লে। আমি লাফ দিয়ে উঠে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলুম, সয়তান, এত বড়ো আস্পর্দ্ধা তোমার! এখনি ধরিয়ে দেব পুলিসের হাতে।—সময় হাতে একটুও ছিল না, নইলে প্রহসনটা শেষ করতুম, নিয়ে যেতুম থানায়। তোমার ছেলেরা যারা পাশের ঘরে ব'সে চা খাচ্ছিল তারা আমার উপর অগ্নিশর্ম্মা; ওকে দেবে ব'লে চাঁদা তোলবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলে, সবার পকেট কুড়িয়ে তেরো আনার বেশি ফণ্ড্‌ উঠল না। ছেলেটা আমার মূর্ত্তি দেখে সরে পড়েছে।"

"তবে তো দেখ্‌ছি তোমার চাক্‌নির ফুটো দিয়ে গন্ধ বেরিয়ে পড়েছে—মাছির আমদানি সুরু হোলো।"

"সন্দেহ নেই। ভায়া, এখনি ছড়িয়ে ফেলো তোমার ছেলেগুলোকে দূরে দূরে—ওদের একজনও যেন বেকার না থাকে। Ostensible means of livelihood প্রত্যেকেরই থাকা চাই।"

"চাই নিশ্চয়ই। কিন্তু উপায় ঠাউরেছ?"

"অনেকদিন থেকে। হাত খোলসা ছিল না, নিজে করতে পারিনি। ভেবে রেখেছি, উপকরণও জমিয়েছি ধীরে ধীরে। মাধব কবিরাজ বিক্রি করে জ্বরাশনি বটিকা, তার বারো আনা কুইনীন্। সেগুলো তার কাছ থেকে নিয়ে লেবেল্ বদ্‌লে নাম দেব ম্যালেরিয়ারি গুটিকা, কুইনীনের পিছনে অনেকখানি মিথ্যে কথা জুড়তে হবে। প্রতুল সেনকে লাগানো যাবে ক্যাম্বিশের ব্যাগ হাতে ঐ গুটিকা প্রচার করার কাজে। তোমার নিবারণ ফষ্টক্লাস এম্, এস্, সি, লজ্জা ত্যাগ ক'রে পড়ুক্ ভৈরবী কবচ নিয়ে, এই কবচে সপ্তধাতুর উপরে নব্য রসায়নের আরো গোটা-কতক নূতন ধাতুর নাম জড়িয়ে প্রাচীন ঋষিদের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব সম্মিলন সাধন করা যেতে পারে। জগবন্ধু সংস্কৃত শ্লোকের উপর ব্যাকরণের ভেল্‌কি লাগিয়ে উচ্চস্বরে প্রমাণ করতে থাকুক যে, চাণক্য জন্মেছিলেন

বাংলাদেশে নেত্রকোণায়, আমারও জন্মস্থান ঐ সাবডিবিশনে। এই নিয়ে সাংঘাতিক কথা কাটাকাটি চলুক্ সাহিত্যে, অবশেষে চাণক্য-জয়ন্তী করা যাবে আমারি প্রপিতামহের পোড়ো ভিটের 'পরে। তোমা-দের ক্যাম্বেলি ডাক্তার তারিণী সাণ্ডেল মা শীতলার মন্দির নির্ম্মাণের জন্যে চাঁদা চেয়ে পাড়া অস্থির ক'রে বেড়াক্। আসল কথা হচ্চে, তোমার সবচেয়ে মাথা-উঁচু গ্রেনেডিয়ার ছেলের দলকে কিছুদিন বাজে ব্যবসায়ে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে—কেউবা ওদের বোকা বলুক, কেউ বা বলুক ওরা চতুর বিষয়ী লোক।"

ইন্দ্রনাথ হেসে বল্‌লে, "তোমার কথা শুনে আমার ইচ্ছে হচ্চে একটা ব্যবসায়ে লাগি। আর কিছুর জন্যে না, কেবল দেউলে হবার কার্য্য-প্রণালী এবং সাই-কোলজি অনুশীলন করবার জন্যে।"

কানাই বল্‌লে, "তুমি যে-ব্যবসায়ে লেগেছ ভায়া, সেটা আজ হোক্ বা কাল হোক্ নিশ্চিত দেউলে হবারই মুখে আছে। যারা দেউলে হয় তারা বোঝে না ব'লে হয় তা নয়, তারা লোকসানের রাস্তা কোনো-মতে ছাড়তে পারে না বলেই হয়—দেউলে হওয়ার মরণটান একটা সাব্লাইম আকর্ষণ। ও বিষয়টা বর্ত্তমানে

আলোচনা ক'রে ফল নেই; একটা প্রশ্ন মনে আছে সেটা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে নিই। এলার মতো সুন্দরী সর্ব্বদা দেখতে পাওয়া যায় না—এ কথা মানো কি না?"

"মানি বই কী।"

"তা হোলে ওকে তোমাদের মধ্যে রেখেছ কোন্ সাহসে?"

"কানাই, এতদিনে আমাকে তোমার বোঝা উচিত ছিল। আগুনকে যে ভয় করে সে আগুনকে ব্যবহার করতে পারে না। আমার কাজে আমি আগুনকে বাদ দিতে চাইনে।"

"অর্থাৎ তাতে কাজ নষ্ট হোক্ বা না হোক্—তুমি কেয়ার করো না।"

"সৃষ্টিকর্ত্তা আগুন নিয়ে খেলা করে। নিশ্চিত ফলের হিসেব ক'রে সৃষ্টির কাজ চলে না; অনিশ্চিতের প্রত্যাশাতেই তার বিরাট প্রবর্ত্তনা। ঠাণ্ডা মালমসলা নিয়ে বুড়ো আঙুলে টিপে টিপে যে পুতুল গড়া হয় তার বাজারদর খতিয়ে লোভ করবার মন আমার নয়। ঐ যে অতীন ছেলেটা এসেছে এলার টানে, ওর মধ্যে বিপদ ঘটাবার ডাইনামাইট্ আছে,—ওর প্রতি তাই আমার এত ঔৎসুক্য।"

"ভায়া, তোমার এই ভীষণ ল্যাবরেটরিতে আমরা ঝাড়ন কাঁধে বেহারার কাজ করি মাত্র। ক্ষেপে ওঠে যদি কোনো গ্যাস্, যদি কোনো যন্ত্র ফেটে ফুটে ছিট্‌কে পড়ে তাহোলে আমাদের কপাল ভাঙবে সাতখানা হয়ে। সেটা নিয়ে গর্ব্ব করবার মতো জোর আমাদের খুলির তলায় নেই।"

"জবাব দিয়ে বিদায় নেও না কেন?"

"ফলের লোভ যে আছে আমাদের, তোমার না থাকতে পারে। তোমারি দালালদের মুখে একদা শুনেছিলুম Elixir of life হয়তো মিলতে পারে। তোমার এই সর্ব্বনেশে রিসর্চ্চের চক্রান্তে গরীব আমরা ধরা দিয়েছি নিশ্চিত আশারই টানে, অনিশ্চিতের কুহকে নয়। তুমি এটাকে দেখ্‌ছ জুয়োখেলার দিক থেকে, আমরা দেখ্‌ছি ব্যবসার সাদা চোখে। অবশেষে খতেনের খাতায় আগুন লাগিয়ে আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা কোরো না, ভায়া। ওর প্রত্যেক শিকি পয়সায় আছে আমাদের বুকের রক্ত।"

"আমার মনে কোনো অন্ধ বিশ্বাস নেই কানাই। হার-জিতের কথা ভাবা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। প্রকাণ্ড কর্ম্মের ক্ষেত্রে আমি কর্ত্তা, এইখানেই আমাকে

মানায় ব'লেই আমি আছি,—এখানে হারও বড়ো জিতও বড়ো। ওরা চারদিকের দরজা বন্ধ ক'রে আমাকে ছোটো করতে চেয়েছিল, মরতে মরতে প্রমাণ করতে চাই আমি বড়ো। আমার ডাক শুনে কত মানুষের মতো মানুষ মৃত্যুকে অবজ্ঞা ক'রে চারিদিকে এসে জুটল; সে তো তুমি দেখতে পাচ্চ কানাই। কেন? আমি ডাকতে পারি ব'লেই। সেই কথাটা ভালো করে জেনে এবং জানিয়ে যাব, তার পরে যা হয় হোক। তোমাকে তো বাইরে থেকে একদিন দেখতে ছিল সামান্য কিন্তু তোমার অসামান্যকে আমি প্রকাশিত করেছি। রসিয়ে তুল্‌লুম তোমাদের, মানুষ নিয়ে এই আমার রসায়নের সাধনা। আর বেশি কী চাই? ঐতিহাসিক মহাকাব্যের সমাপ্তি হোতে পারে পরাজয়ের মহাশ্মশানে। কিন্তু মহাকাব্য তো বটে! গোলামি-চাপা এই খর্ব্ব মনুষ্যত্বের দেশে মরার মতো মরতে পারাও যে একটা সুযোগ।"

"ভায়া, আমার মতো অকাল্পনিক প্র্যাক্‌টিক্যাল লোককেও তুমি টান মেরে এনেছ ঘোরতর পাগ্‌লামির তাণ্ডব নৃত্যমঞ্চে। ভাবি যখন, এ রহস্যের অন্ত পাইনে আমি।"

"আমি কাঙালের মতো ক'রে কিছুই চাইনে ব'লেই তোমাদের 'পরে আমার এত জোর। মায়া দিয়ে ভুলিয়ে লোভ দেখিয়ে ডাকি নে কাউকে। ডাক দিই অসাধ্যের মধ্যে, ফলের জন্যে নয়, বীর্য্যপ্রমাণের জন্যে। আমার স্বভাবটা ইম্পার্সোন্যাল্। যা অনিবার্য্য তাকে আমি অক্ষুব্ধমনে স্বীকার করে নিতে পারি। ইতিহাস তো পড়েছি, দেখেছি কত মহা মহা সাম্রাজ্য গৌরবের অভ্রভেদী শিখরে উঠেছিল আজ তারা ধূলোয় মিলিয়ে গেছে,—তাদের হিসাবের খাতায় কোথায় মস্ত একটা দেনা জমে উঠেছিল যা তারা শোধ করেনি। আর এই দেশ যেহেতু এ আমারি দেশ, সৌভাগ্যের চির স্বত্ব নিয়ে ইতিহাসের উঁচু গদীতে গদিয়ান হয়ে বসে থাক্‌বে পরাভবের সমস্ত কারণগুলোর গায়ে সিঁদূর চন্দন মাখিয়ে ঘণ্টা নেড়ে পুজো করতে করতে, বোকার মতো এমন আবদার কর্‌ব কার কাছে? আমি তা কখনোই করিনে। বৈজ্ঞানিকের নির্ম্মোহ মন নিয়ে মেনে নিই যার মরণদশা সে মরবেই।"

"তবে!"

"তবে! দেশের চরম দুরবস্থা আমার মাথা হেঁট করতে পারবে না, আমি তারো অনেক ঊর্দ্ধে—

আত্মার অবসাদ ঘটতে দেব না মরবার সমস্ত লক্ষণ দেখেও।”

“আর আমরা!”

“তোমরা কি খোকা! মাঝদরিয়ায় যে-জাহাজের তলা গিয়েছে সাত জায়গায় ফাঁক হয়ে, কেঁদে কেটে মন্ত্র প’ড়ে কর্ত্তার দোহাই পেড়ে তাকে বাঁচাতে পারবে?”

“না যদি পারি তবে?”

“তবে কী! তোমরা ক-জনে জেনে শুনে সেই ডুবো জাহাজেই ঝড়ের মুখে সাংঘাতিক পাল তুলে দিয়েছ, তোমাদের পাঁজর কাঁপেনি। এমন যে-ক’জনকে পাই ডুবতে ডুবতে তাদের নিয়েই আমাদের জিৎ। রসাতলে যাবার জন্যে যে-দেশ অন্ধভাবে প্রস্তুত তারি মাস্তুলে তোমরা শেষ পর্য্যন্ত জয়ধ্বজা উড়িয়েছ, তোমরা না করেছ মিথ্যে আশা, না করেছ কাঙালপনা, না কেঁদেছ নৈরাশ্যে হাউ হাউ ক’রে। তোমরা তবু হাল ছাড়োনি যখন জলে ভরেছে জাহাজের খোল। হাল ছাড়াতেই কাপুরুষতা—বাস্, আমার কাজ হয়ে গেছে তোমাদের যে-ক’জনকে পেয়েছি তাদেরই নিয়ে। তার পরে? কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।”

"তুমি যা বল্‌ছ তার মধ্যে থেকে একটা প্রধান কথা বাদ গেছে ব'লে বোধ হয়।"

"কোন্‌ কথাটা ?"

"তোমার মনে কি রাগও নেই ? এত ইম্পার্সোনল তুমি !"

"রাগ কার 'পরে ?"

"ইংরেজের 'পরে।"

"যে জোয়ান মদ খেয়ে চোখ লাল না করলে লড়তে পারেই না, সেই গ্রাম্যকে আমি অবজ্ঞা করি। রাগের মাথায় কর্ত্তব্য করতে গেলে অকর্ত্তব্য করার সম্ভাবনাই বেশি।"

"তা হোক্‌, কিন্তু রাগের কারণ থাকলে রাগ না করাটা অমানবিক।"

"সমস্ত য়ুরোপের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, আমি ইংরেজকেও জানি। যত পশ্চিমী জাত আছে তার মধ্যে ওরা সব চেয়ে বড়ো জাত। রিপুর তাড়ায় ওরা যে মারতে পারে না তা নয় কিন্তু পুরোপুরি পারে না— লজ্জা পায়। ওদের নিজেদের মধ্যে যারা বড়ো তাদেরই কাছে জবাবদিহি করতে ওদের সব চেয়ে ভয়; —ওরা নিজেকে ভোলায় তাদেরও ভোলায়। ওদের

উপরে যতটা রাগ করলে ফুল্‌ষ্টীম বানিয়ে তোলা যায় ততটা রাগ আমার দ্বারা সম্ভব হয় না।"

"অদ্ভুত তুমি।"

"ষোলো আনা মারের চোটে আমাদের মেরুদণ্ড ওরা চিরকালের মতো গুঁড়িয়ে দিতে পার্‌ত। সেটা ওরা পারলে না। আমি ওদের মনুষ্যত্বকে বাহাদুরী দিই। পরের দেশ শাসন করতে করতে সেই মনুষ্যত্ব ক্ষয় হয়ে আস্‌ছে তাতেই মরণদশা ধরছে ওদের ভিতর থেকে। এত বেশি বিদেশের বোঝা আর কোনো জাতের ঘাড়ে নেই এতে ওদের স্বভাব যাচ্চে নষ্ট হয়ে।"

"সে ওরা বুঝবে। কিন্তু তোমার এই অধ্যবসায়কে প্রায় অহৈতুক করে তুলেছ এটা আমার কাছে বাড়াবাড়ি ঠেকে।"

"অত্যন্ত ভুল! আমি অবিচার করব না, উন্মত্ত হব না, দেশকে দেবী ব'লে মা মা ব'লে অশ্রুপাত করব না, তবু কাজ করব, এতেই আমার জোর!"

"শত্রুকে যদি শত্রু ব'লে তাকে দ্বেষ না করো তবে তার বিরুদ্ধে হাত চালাবে কী ক'রে?"

"রাস্তায় পাথর পড়ে থাকলে তার বিরুদ্ধে হাতিয়ার

চালাই যেমন ক'রে, অপ্রমত্ত বুদ্ধি নিয়ে। ওরা ভালো কি মন্দ সেটা তর্কের বিষয় নয়। ওদের রাজত্ব বিদেশী রাজত্ব, সেটাতে ভিতর থেকে আমাদের আত্মলোপ করছে—এই স্বভাববিরুদ্ধ অবস্থাকে নড়াতে চেষ্টা ক'রে আমার মানবস্বভাবকে আমি স্বীকার করি।"

"কিন্তু সফলতা সম্বন্ধে তোমার নিশ্চিত আশা নেই।"

"নাই রইল, তবু নিজের স্বভাবের অপমান ঘটাব না—সামনে মৃত্যুই যদি সব চেয়ে নিশ্চিত হয় তবুও। পরাভবের আশঙ্কা আছে ব'লেই স্পর্দ্ধা ক'রে তাকে উপেক্ষা ক'রে আত্ম-মর্য্যাদা রাখতে হবে। আমি তো মনে করি এইটেই আজ আমাদের শেষ কর্ত্তব্য।"

"ঐ আসছেন রক্তগঙ্গা বওয়াবার মেকি ভগীরথ। ওঁকে চা খাইয়ে আসিগে। সেই সঙ্গে স্পষ্টভাষায় খবরও দেব যে, পুলিসকে সব কথা রিপোর্ট করা হয়েছে। তোমার দলের বোকারা আমাকে লিঞ্চ্ ক'রে না বসে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

এলা বসে আছে কেদারায়, পিঠে বালিশ গোঁজা। লিখছে এক মনে। পায়ের উপর পা তোলা। দেশ-বন্ধুর মূর্ত্তি-আঁকা খাতা কাঠের বোর্ডে কোলের উপর আড় ক'রে ধরা। দিন ফুরোতে দেরি নেই, কিন্তু তখনো চুল রয়েছে অযত্নে। বেগ্‌নি রঙের খদ্দরের সাড়ি গায়ে, সেটাতে মলিনতা অব্যক্ত থাকে, তাই নিভৃতে ব্যবহারে তার অনাদৃত প্রয়োজন। এলার হাতে এক জোড়া লাল রং-করা শাঁখা, গলায় এক ছড়া সোনার হার। হাতির দাঁতের মতো গৌরবর্ণ শরীরটি আঁটসাঁট; মনে হয় বয়স খুব কম কিন্তু মুখে পরিণত বুদ্ধির গাম্ভীর্য্য। খদ্দরের সবুজরঙের চাদরে ঢাকা সঙ্কীর্ণ লোহার খাট ঘরের প্রান্তে দেয়াল-ঘেঁষা। নারায়ণী স্কুলের তাঁতেবোনা সতরঞ্চ মেঝের উপর পাতা। একধারে লেখবার ছোটো টেবিলে ব্লটিং প্যাড্; তার এক পাশে কলম পেন্সিল সাজানো দোয়াতদান, অন্যধারে পিতলের ঘটিতে গন্ধরাজ ফুল। দেয়ালে ঝুল্‌ছে কোনো একটি দূরবর্ত্তী কালের ফোটো-

গ্রাফের প্রেতাত্মা, ক্ষীণ হল্‌দে রেখায় বিলীনপ্রায়। অন্ধকার হোলো, আলো জ্বালবার সময় এসেছে। উঠি-উঠি করছে এমন সময় খদ্দরের পর্দ্দাটা সরিয়ে দিয়ে অতীন্দ্র দমকা হাওয়ার মতো ঘরে ঢুকেই ডাক দিল, "এলী"।

এলা খুসিতে চম্‌কে উঠে বল্‌লে,—"অসভ্য, জানান্ না দিয়ে এ ঘরে আসতে সাহস করো!"

এলার পায়ের কাছে ধপ্ করে মেঝের উপর বসে অতীন বল্‌লে, "জীবনটা অতি ছোটো, কায়দাকানুন অতি দীর্ঘ, নিয়ম বাঁচিয়ে চলবার উপযুক্ত পরমায়ু ছিল সনাতন যুগে মান্ধাতার। কলিকালে তার টানাটানি পড়েছে।"

"আমার কাপড় ছাড়া হয়নি এখনো।"

"ভালোই। তাহোলে আমার সঙ্গে মিশ খাবে। তুমি থাকবে রথে, আমি থাকব পদাতিক হয়ে—এরকম দ্বন্দ্ব মনুর নিয়মে অধর্ম্ম। এককালে আমি ছিলুম নিখুঁৎ ভদ্রলোক, খোলোষটা তুমিই দিয়েছ ঘুচিয়ে। বর্ত্তমান বেশভূষাটা দেখছ কী রকম?"

"অভিধানে ওকে বেশভূষা বলে না।"

"কী বলে তবে?"

"শব্দ পাচ্চিনে খুঁজে। বোধ হয় ভাষায় নেই। জামার সাম্‌নেটাতেই ঐ যে বাঁকাচোরা ছেঁড়ার দাগ, ও কি তোমার স্বকৃত সেলাইয়ের লম্বা বিজ্ঞাপন?"

"ভাগ্যের আঘাত দারুণ হোলেও বুক পেতেই নিয়ে থাকি—ওটা তারি পরিচয়। এ জামা দর্‌জিকে দিতে সাহস হয় না, তার তো আত্মসম্মান-বোধ আছে।"

"আমাকে দিলে না কেন?"

"নব যুগের সংস্কারভার নিয়েছ,তার উপরে পুরোনো জামার সংস্কার?"

"ওটাকে সহ্য করবার এমনি কী দরকার ছিল?"

"যে দরকারে ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে সহ্য করে।"

"তার অর্থ?"

"তার অর্থ, একটির বেশি নেই ব'লে।"

"কী বলো তুমি অন্তু! বিশ্বসংসারে তোমার ঐ একটি বই জামা আর নেই?"

"বাড়িয়ে বলা অন্যায়, তাই কমিয়ে বল্‌লুম। পূর্ব্ব আশ্রমে শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রবাবুর জামা ছিল বহুসংখ্যক ও বহুবিধ। এমন সময়ে দেশে এলো বন্যা। তুমি বক্তৃতায় বল্‌লে, যে অশ্রুপ্লাবিত দুর্দ্দিনে, (মনে আছে অশ্রুপ্লাবিত বিশেষণটা?) বহু নরনারীর লজ্জা রক্ষার

মতো কাপড় জুটছে না, সে সময়ে আবশ্যকের অতিরিক্ত কাপড় যার আছে লজ্জা তারই। বেশ গুছিয়ে বলেছিলে। তখনো তোমার সম্বন্ধে প্রকাশ্যে হাসতে সাহস ছিল না। মনে মনে হেসেছিলুম। নিশ্চিত জানতুম আবশ্যকের বেশি জামা ছিল তোমার বাক্সে। কিন্তু মেয়েদের পঞ্চাশ রঙের পঞ্চাশটা জামা থাকলেও পঞ্চাশটাই অত্যাবশ্যক। সেদিন দেশহিতৈষিণীদের মধ্যে রেশারেশি চলছিল,—কে কত দান সংগ্রহ করতে পারে। এনে দিলুম আমার কাপড়ের তোরঙ্গ তোমার চরণতলে। হাততালি দিয়ে উঠলে খুসিতে।”

“সে কী কথা! আমি কি জানি অমন নিঃশেষ করে দেবে?”

“আশ্চর্য্য হও কেন? দুঃসাধ্য ক্ষতিসাধনের শক্তি এই দেহে দুর্জ্জয়বেগে সঞ্চার করলে কে? সংগ্রহের ভার যদি থাকত আমাদের গণেশ মজুমদারের ’পরে তাহোলে তার পৌরুষ আমার কাপড়ের বাক্সে ক্ষতি করত অতি সামান্য।”

“ছি ছি অন্তু, কেন আমাকে বল্‌লে না?”

“দুঃখ কোরো না। একান্ত শোচনীয় নয়, দুটো জামা রাঙিয়ে রেখে দিলুম নিত্য আবশ্যকের গরজে,

পালা ক'রে কেচে পরা চল্‌ছে। আরো দুটো আছে আপদ্ধর্ম্মের জন্যে ভাঁজ করা। যদি কোনোদিন সন্দিগ্ধ সংসারে ভদ্রবংশীয় ব'লে প্রমাণ দেবার প্রয়োজন ঘটে সেই জামা দুটোতে ধোবা-দরজির সার্টিফিকেট রইল।"

"সৃষ্টিকর্ত্তার সার্টিফিকেট রয়েছে ঐ চেহারাতেই—সাক্ষী ডাকতে হবে না তোমার।"

"স্তুতি! নারীর দরবারে স্তবের অত্যুক্তি চিরদিন পুরুষদেরই অধিকারভুক্ত, তুমি উল্‌টিয়ে দিতে চাও?"

"হাঁ চাই। প্রচার করতে চাই, আধুনিক কালে মেয়েদের অধিকার বেড়ে চলেছে। পুরুষের সম্বন্ধেও সত্য বলতে তাদের বাধা নেই। নব্য সাহিত্যে দেখি—বাঙালী মেয়েরা নিজেদেরই প্রশংসায় মুখরা, দেবীপ্রতিমা বানাবার কুমোরের কাজটা নিজেরাই নিয়েছে। স্বজাতির গুণ গরিমার উপরে সাহিত্যিক রং চড়াচ্চে। সেটা তাদের অঙ্গরাগেরই সামিল, স্বহস্তের বাঁটা, বিধাতার হাতের নয়। আমার এতে লজ্জা করে। এখন চলো বসবার ঘরে।"

"এঘরেও বসবার জায়গা আছে। আমি তো একাই একটা বিরাট সভা নই।"

"আচ্ছা তবে বলো জরুরী কথাটা কী ?"

"হঠাৎ কবিতার একটা পদ মনে পড়ে গেছে অথচ কোথায় পড়েছি কিছুতেই মনে আসছে না। সকাল থেকে হাওয়া হাৎড়িয়ে বেড়াচ্চি। তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এলুম।"

"অত্যন্ত জরুরী দেখছি। আচ্ছা বলো।"

"একটু ভেবে বলো কার রচনা :—

তোমার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্ব্বনাশ।"

"কোনো নামজাদা কবির তো নয়ই।"

"পূর্ব্বশ্রুত ব'লে মনে হচ্চে না তোমার ?"

"চেনা গলার আভাস পাচ্চি একটুখানি। অন্য লাইনটা গেল কোথায় ?"

"আমার বিশ্বাস ছিল, অন্য লাইনটা আপনিই তোমার মনে আসবে।"

"তোমার মুখে যদি একবার শুনি তাহোলে নিশ্চয় মনে আস্‌বে।"

"তবে শোনো :—

প্রহর শেষের আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্রমাস,
তোমার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্ব্বনাশ।”

অতীনের মাথায় করাঘাত ক'রে এলা বল্‌লে,—“আজকাল কী পাগলামি সুরু করেছ তুমি ?”

“সেই চৈত্রমাসের বারবেলা থেকেই আমার পাগলামি সুরু। যে সব দিন চরমে না পৌঁছতেই ফুরিয়ে যায় তারা ছায়ামূর্ত্তি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কল্পলোকের দিগন্তে। তোমার সঙ্গে আমার মিলন সেই মরীচিকার বাসর ঘরে। আজ সেইখানে তোমাকে ডাক দিতে এলুম—কাজের ক্ষতি কর্‌ব।”

কাঠের বোর্ড আর খাতাখানা মেঝের উপর ফেলে দিয়ে এলা বল্‌লে, “থাক্ প'ড়ে আমার কাজ। আলোটা জ্বেলে দিই।”

“না থাক্—আলো প্রত্যক্ষকে প্রমাণ করে, চলো দীপহীন পথে অপ্রত্যক্ষের দিকে। চার বছরের কিছু কম হবে, ষ্টীমারে খেয়া পার হচ্চি মোকামার ঘাটে। তখনো আঁক্‌ড়ে ছিলুম পৈতৃক সম্পত্তির ভাঙা কিনারটাকে সেটা ছিল দেনার গর্ত্তে ভরা। তখনো দেহে মনে সৌখীন-

তার রং লেগে ছিল দেউলে দিনান্তের মেঘের মতো। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, পাট-করা মুগার চাদর কাঁধে; একলা বসে আছি ফর্ষ্টক্লাস ডেক্-এ বেতের কেদারায়। ফেলে-দেওয়া খবরের কাগজের পাতাগুলো ফরফর ক'রে এধারে ওধারে উড়ে বেড়াচ্ছিল, মজা লাগছিল দেখতে, মনে হচ্ছিল মূর্ত্তিমতী জনশ্রুতির এলোমেলো নৃত্য। তুমি জনসাধারণের দলে, কোমর বেঁধে ডেক্-প্যাসেঞ্জার। হঠাৎ আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী অগোচরতার মধ্য থেকে দ্রুতবেগে এসে পড়লে আমার সামনে। আজো চোখের উপর দেখতে পাচ্চি তোমার সেই ব্রাউন রঙের সাড়ি; খোঁপার সঙ্গে কাঁটায় বেঁধা তোমার মাথার কাপড় মুখের দুইধারে হাওয়ায় ফুলে' উঠেছে। চেষ্টাকৃত অসঙ্কোচের ভান করেই প্রশ্ন করলে,—আপনি খদ্দর পরেন না কেন?—মনে পড়ছে?"

"খুব স্পষ্ট। তোমার মনের ছবিকে তুমি কথা কওয়াতে পারো, আমার ছবি বোবা।"

"আমি আজ সেদিনের পুনরুক্তি করে যাব, তোমাকে শুন্‌তে হবে।"

"শুন্‌ব না তো কী। সেদিন যেখানে আমার নূতন

জীবনের ধুয়ো, পুনঃ পুনঃ সেখানে আমার মন ফিরে আসতে চায়।”

“তোমার গলার সুরটি শুনেই আমার সর্ব্বশরীর চম্‌কে উঠ্‌ল, সেই সুর আমার মনের মধ্যে এসে লাগ্‌ল হঠাৎ আলোর ছটার মতো ; যেন আকাশ থেকে কোন্‌ এক অপরূপ পাখী ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আমার চিরদিনটাকে। অপরিচিতা মেয়েটির অভাবনীয় স্পর্দ্ধায় যদি রাগ করতে পারতুম তাহোলে সেদিনকার খেয়াতরী এত বড়ো আঘাটায় পৌঁছিয়ে দিত না—ভদ্র পাড়াতেই শেষ পর্য্যন্ত দিন কাট্‌ত চল্‌তি রাস্তায়। মনটা আর্দ্র দেশালাই কাঠির মতো, রাগের আগুন জ্বল্‌লনা। অহঙ্কার আমার স্বভাবের সর্ব্বপ্রধান সদ্‌গুণ, তাই ধাঁ করে মনে হোলো, মেয়েটি যদি আমাকে বিশেষভাবে পছন্দ না করত তাহোলে এমন বিশেষভাবে ধমক দিতে আসত না, খদ্দরপ্রচার—ও একটা ছুতো, সত্যি কিনা বলো।”

“ওগো, কতবার বলেছি,—অনেকক্ষণ ধ’রে ডেকের কোণে ব’সে তোমাকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলুম। ভুলে গিয়েছিলুম আর কেউ সেটা লক্ষ্য করছে কি না। জীবনে সেই আমার সবচেয়ে আশ্চর্য্য এক-চমকের চির-

পরিচয়। মন বল্‌লে, কোথা থেকে এ'লো এই অতি দূর জাতের মানুষটি, চারদিকের পরিমাপে তৈরি নয়, শ্যাওলার মধ্যে শতদল পদ্ম। তখনি মনে মনে পণ করলুম এই দুর্লভ মানুষটিকে টেনে আন্‌তে হবে, কেবল আমার নিজের কাছে নয়, আমাদের সকলের কাছে।"

"আমার কপালে তোমার একবচনের চাওয়াটা চাপা পড়ল বহুবচনের চাওয়ার তলায়।"

"আমার উপায় ছিল না অন্তু। দ্রৌপদীকে দেখবার আগেই কুন্তী বলেছিলেন, তোমরা সবাই মিলে ভাগ করে নিয়ো। তুমি আসবার আগেই শপথ করে দেশের আদেশ স্বীকার করেছি, বলেছি আমার একলার জন্যে কিছুই রাখব না। দেশের কাছে আমি বাগ্‌দত্তা।"

"অধার্ম্মিক তোমার পণগ্রহণ, এ পণকে রক্ষা করাও প্রতিদিন তোমার স্বধর্ম্মবিদ্রোহ। পণ যদি ভাঙতে তবে সত্য রক্ষা হোতো। যে লোভ পবিত্র যা অন্তর্য্যামীর আদেশবাণী, তাকে দলের পায়ে দলিত করেছ এর শাস্তি তোমাকে পেতে হবে।"

"অন্তু, শাস্তির সীমা নেই, দিনরাত মারছে

আমাকে। যে আশ্চর্য্য সৌভাগ্য সকল সাধনার অতীত, যা দৈবের অযাচিত দান তা এলো আমার সাম্‌নে, তবু নিতে পারলুম না। হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁঠবাঁধা, তৎসত্ত্বেও এত বড়ো দুঃসহ বৈধব্য কোনো মেয়ের ভাগ্যে যেন না ঘটে। একটা মন্ত্রপড়া বেড়ার মধ্যে ছিলুম, কিন্তু তোমাকে দেখবামাত্র মন উৎসুক হয়ে উঠ্‌ল, বল্‌লে—ভাঙুক সব বেড়া। এমন বিপ্লব ঘটতে পারে সেকথা কোনোদিন ভাবতে পারিনি। এর আগে কখনো মন বিচলিত হয়নি বল্‌লে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু চঞ্চলতা জয় ক'রে খুসি হয়েছি নিজের শক্তির গর্ব্বে। জয় করবার সেই গর্ব্ব আজ নেই, ইচ্ছে হারিয়েছি—বাহিরের কথা ছেড়ে দাও, অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখো, হেরেছি আমি। তুমি বীর, আমি তোমার বন্দিনী।"

"আমিও হেরেছি আমার সেই বন্দিনীর কাছে। হার শেষ হয়নি, প্রতি মুহূর্ত্তের যুদ্ধে প্রতি মুহূর্ত্তেই হারছি।"

"অন্তু, ফষ্টক্লাস ডেক্‌-এ যখন অপূর্ব্ব আবির্ভাবের মতো আমাকে দূর থেকে দেখা দিয়েছিলে তখনো জানতুম থর্ডক্লাসের টিকিটটা আমাদের আধুনিক

আভিজাত্যের একটা উজ্জ্বল নিদর্শন। অবশেষে তুমি চড়লে রেলগাড়িতে সেকেণ্ডক্লাসে। আমার দেহমনকে প্রবল টান দিলে সেই ক্লাসের দিকে। এমন কি, মনে একটা চাতুরীর কল্পনা এসেছিল, ভেবেছিলুম, ট্রেন ছাড়বার শেষমুহূর্ত্তে উঠে পড়ব তোমার গাড়িতে, বলব,—তাড়াতাড়িতে ভুলে উঠেছি। কাব্যশাস্ত্রে মেয়েরাই অভিসার করে এসেছে, সংসারবিধিতে বাধা আছে ব'লেই কবিদের এই করুণা। উস্‌খুস-করা মনের যত সব এলোমেলো ইচ্ছে ভিতরের আঁধার কোঠায় ঘুর খেয়ে খেয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে বেড়ায়। এদের কথা মেয়েরা পর্দ্দার বাইরে কিছুতে স্বীকার করতে চায় না। তুমি আমাকে স্বীকার করিয়েছ।"

"কেন স্বীকার করলে ?"

"নারীজাতির গুমর ভেঙে কেবল ঐ স্বীকারটুকুই তোমাকে দিতে পেরেছি, আর তো কিছু পারিনি।"

হঠাৎ অতীন এলার হাত চেপে ধরে ব'লে উঠল, "কেন পারলে না ? কিসের বাধা ছিল আমাকে গ্রহণ করতে ? সমাজ ? জাতিভেদ ?"

"ছি, ছি, এমন কথা মনেও কোরো না। বাইরে বাধা নয়, বাধা অন্তরে।"

"যথেষ্ট ভালোবাসোনি ?"

"ঐ যথেষ্ট কথাটার কোনো মানে নেই অন্তু। যে শক্তি হাত দিয়ে পর্ব্বতকে ঠেলতে পারেনি তাকে দুর্ব্বল ব'লে অপবাদ দিয়ো না। শপথ ক'রে সত্য গ্রহণ করেছিলুম, বিয়ে করব না। না করলেও হয় তো বিয়ে সম্ভব হোতো না।"

"কেন হোতো না ?"

"রাগ কোরো না অন্তু, ভালোবাসি ব'লেই সঙ্কোচ। আমি নিঃস্ব, কতটুকুই বা তোমাকে দিতে পারি।"

"স্পষ্ট করেই বলো।"

"অনেকবার বলেছি।"

"আবার বলো, আজ সব বলা কওয়া শেষ ক'রে নিতে চাই, এর পরে আর জিজ্ঞাসা করব না।"

বাইরে থেকে ডাক এলো, "দিদিমণি।"

"কী রে অখিল, আয় না ভিতরে।"

ছেলেটার বয়স ষোলো কিম্বা আঠারো হবে। জেদালো দুষ্টুমি-ভরা প্রিয়দর্শন চেহারা। কোঁকড়া চুল ঝাঁকড়ামাকড়া ; কচি শামলা রং, চঞ্চল চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। খাকি রঙের শর্টপরা, কোমর পর্য্যন্ত ছাঁটা সেই রঙেরই একটা বোতাম-খোলা জামা, বুক

বের করা; শর্টের দুই দিককার পকেট নানা বাজে সম্পত্তিতে ফুলে-ওঠা, বুকের পকেটে বিচিত্র ফলাওয়ালা একটা হরিণের শিঙের ছুরি; কখনো বা সে খেলার নৌকো কখনো এরোপ্লেনের নমুনা বানায়। সম্প্রতি মল্লিক কোম্পানির আয়ুর্ব্বেদিক বাগানে দেখে এসেছে জলতোলা হাওয়া যন্ত্র; বিস্কুটের টিন প্রভৃতি নানা ফাল্‌তো জিনিষ জোড়াতাড়া দিয়ে তারি নকলের চেষ্টা চল্‌ছে। আঙুল কেটেছে, তার উপরে ন্যাকড়া জড়ানো, এলা জিজ্ঞাসা করলে কানেই আনে না। এলা এই বাপ-মা-মরা ছেলের দূর সম্পর্কের আত্মীয়, অনেক উৎপাত সহ্য করে। কার কাছ থেকে বেঁটে জাতের এক বাঁদর অখিল সস্তা দামে কিনেছে। জন্তুটা ভাঁড়ারে চৌর্য্যবৃত্তিতে সুদক্ষ। এলার ছোটো পরিবারে এই জন্তুটা একটা মস্ত অত্যাচার।

ঘরে ঢুকেই অখিল সলজ্জ দ্রুতবেগে পা ছুঁয়ে এলাকে প্রণাম করলে। এলা বুঝলে প্রণামটা একটা কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের অন্তর্গত, কেননা ভক্তি-বৃত্তিটা অখিলের স্বভাবসিদ্ধ নয়।

এলা বল্‌লে, "তোর অন্তু দাদাকে প্রণাম করবিনে?"

কোনো জবাব না দিয়ে অখিল অতীনের দিকে পিঠ

ফিরিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে রইল। অতীন উচ্চস্বরে হেসে উঠ্‌ল। অখিলের পিঠ চাপড়িয়ে বল্‌লে, "সাবাস্‌, মাথা যদি হেঁট করতেই হয় তো এক-দেবতার পায়ে। সেই একেশ্বরীর কাছে আমারও মাথা হেঁট, এখন প্রসাদের ভাগ নিয়ে রাগারাগি কোরো না ভাই, উদ্বৃত্তই বেশি।"

এলা অখিলকে বল্‌লে, "তোর কী কথা আছে ব'লে যা।"

অখিল বল্‌লে, "কাল আমার মায়ের মৃত্যুদিন।"

"তাই তো! একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। কাউকে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করতে চাস্‌?"

"কাউকে না।"

"তবে কী চাস্‌?"

"পড়ার ছুটি চাই তিনদিন।"

"কী করবি ছুটি নিয়ে?"

"খরগোষের খাঁচা বানাব।"

"খরগোষ তোর একটিও বাকি নেই, খাঁচা বানাবি কার জন্যে?"

অতীন হেসে বল্‌লে, "খরগোষতো কল্পনা করলেই হয়, খাঁচাটা বানানোই আসল কথা। মানুষ অনিত্য,

আসে আর যায় কিন্তু নিত্যকালের মতো পাকা ক'রে তাদের খাঁচা বানাবার ভার নিয়েছেন ভগবান মনু থেকে আরম্ভ ক'রে মনুর আধুনিক অবতার পর্য্যন্ত। এই কাজে তাঁদের ভীষণ সখ।"

"আচ্ছা, অখিল যা তোর ছুটি!"

দ্বিতীয় কথাটি না ব'লে অখিল দৌড়ে চলে গেল।

অতীন বল্‌লে, "ওকে পোষ মানাতে পারলুম না। আমার সাবেক সম্পত্তির ঝড়্‌তি-পড়্‌তির মধ্যে ছিল একটা কব্‌জি ঘড়ি, আধুনিক ছেলেদের পক্ষে সাত-রাজার ধন। একদিন সেটা ওকে দিতে গিয়েছিলুম। মাথা ঝাঁকানি দিয়ে চলে গেল। এর থেকে বুঝবে ওতে আমাতে ব্যাপারটা কম্যুন্যাল হয়ে উঠেছে, অন্তু-অখিল রায়ট্ হবার লক্ষণ।"

"ছেলেদের সঙ্গে ভাব করতে তোমার জুড়ি কেউ নেই, তবু এই বাঁদরটার কাছে হার মান্‌লে কেন?"

"মাঝখানে আছে তৃতীয় পক্ষ, নইলে ওতে আমাতে হরিহর ব'নে যেতুম। থাক্ সে কথা; এখন বলো, তোমার কৈফিয়ৎটা কী? কেন আমাকে সরিয়ে রাখ্‌লে?"

"একটা সোজা কথা কেন তুমি মনে রাখো না যে, তোমার চেয়ে আমি বয়সে বড়ো ?"

"কারণ এই সোজা কথাটা ভুলতে পারিনি যে, তোমার বয়স আটাশ, আমার বয়স আটাশ পেরিয়ে কয়েক মাস। প্রমাণ করা খুব সহজ, কারণ দলিলটা তাম্রশাসনে ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা নয়।"

"আমার আটাশ তোমার আটাশকে বহুদূরে পেরিয়ে গেছে। তোমার আটাশে যৌবনের সব সল্‌তেই নির্ধূম জ্বল্‌ছে। এখনো তোমার জানলা খোলা যাদের দিকে, তারা অনাগত তারা অভাবিত।"

"এলী, আমার কথাটা কিছুতে বুঝতে চাচ্চ না ব'লেই বুঝছ না। দলের কাছে ভগবানের সত্যের বিরুদ্ধে সত্য নিয়েছ তাই নানা তর্ক বানিয়ে নিজেকে ভোলাচ্চ, আমাকেও। ভোলাও কিন্তু এ কথা বোলো না আমার জীবনে এখনো অনাগত অভাবিত দূরে রয়ে গেছে। এসেছে সে, সে তুমি। তবুও আজও সে অনাগত! চিরদিনই কি তবে জানলা খোলা থাকবে তার দিকে ? সেই শূন্যের ভিতর দিয়ে কেবলি বাজবে আমার আর্ত্তস্বুর, চাই তোমাকে চাই, আর অন্য দিক দিয়ে ফিরে আসবে না কোনো উত্তর ?"

"ফিরে আসছে না, এমন কথা বল্‌ছ কী ক'রে অকৃতজ্ঞ ? চাই, চাই, চাই, তোমার চেয়ে বেশি কিছুই চাইনে এ জগতে। যে সময়ে দেখা হোলে শুভ-দৃষ্টি সম্পূর্ণ হোতো সে সময়ে হয়নি যে দেখা। কিন্তু তবু বলছি ভাগ্যে হয়নি।"

"কেন ? কী ক্ষতি হোতো তাতে ?"

"আমার জীবন সার্থক হোতো, কতটুকুই বা তার দাম। কারো মতো নও যে তুমি ; মস্ত তুমি। তফাতে আছি ব'লেই দেখতে পেলুম সেই তোমার অলোক-সামান্য প্রকাশ। সামান্য আমাকে দিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ফেল্‌বার কথা কল্পনা করতে আমার ভয় করে। আমার ছোটো সংসারে প্রতিদিনের তুচ্ছতার মানুষ হবে তুমি ! আমি কত উপরে মুখ তুলে তোমার মাথা দেখতে পাই তোমাকে বোঝাব কেমন ক'রে ? মেয়ে-দের সম্বল জীবনের যত সব খুঁটিনাটি, সেই বোঝা দিয়ে তোমাদের মতো পুরুষের জীবনকেও চাপা দিতে ভয় পায় না এমন মেয়ে হয়তো আছে ; তারা ট্র্যাজেডি ঘটিয়েছে কত আমি তা জানি। চোখের সামনে দেখেছি লতার জালে বনস্পতিকে বাড়তে দিল না ; সেই মেয়েরা বুঝি মনে করে তাদের জড়িয়ে ধরাই যথেষ্ট !"

"এলা, যে পায় সেই জানে যথেষ্ট কাকে বলে।"

"নিজেকে ভোলাতে চাইনে, অন্তু। প্রকৃতি আমাদের আজন্ম অপমান করেছে। আমরা বায়োলজির সংকল্প বহন ক'রে এসেছি জগতে। সঙ্গে সঙ্গে এনেছি জীবপ্রকৃতির নিজের জোগানো অস্ত্র ও মন্ত্র। সেগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করতে জানলেই সস্তায় আমরা জিতে নিতে পারি আমাদের সিংহাসন। সাধনার ক্ষেত্রে পুরুষকে প্রমাণ করতে হয় তার শ্রেষ্ঠতা। সেই শ্রেষ্ঠতা যে কী, ভাগ্যক্রমে আমি তা জানবার সুযোগ পেয়েছি। পুরুষরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো।"

"মাথায় বড়ো।"

"হঁা মাথায় বড়োই তো। প্রকৃতিকে অতিক্রম ক'রে বড়ো হবার তোরণ-দ্বার সেই মাথায়। আমার বুদ্ধিসুদ্ধি যথেষ্ট থাক্ না থাক্ আমি নম্র হয়ে নিজেকে নিবেদন করতে পেরেছি সেই উপরের দিকে চেয়ে।"

"কোনো নীচ উৎপাত করেনি?"

"করেছে। আমাদের টানে যারা নেমে আসে বায়োলজির নীচের তলায়, তারা বিশ্রী হয়ে বিগ্‌ড়ে যায়। ব্যক্তিগত বিশেষ ইচ্ছে বা প্রয়োজন না থাকলেও

নীচে টেনে আন্‌বার একটা সাধারণ ষড়যন্ত্রে আমরা সমস্ত মেয়ে এক হয়ে যোগ দিয়েছি, সাজে সজ্জায় হাবেভাবে বানানো কথায়।”

“বোকাদের ভোলাবার জন্যে?”

“হাঁ গো, তোমরা বোকা! অতি সহজ মন্ত্রেই ভোলো, তাই আমাদের এত গুমর। আমরা বোকাদের ভালোবেসেছি, তবু তাদের স্থূল বোকামির সর্ব্বোচ্চ শিখরে দেখেছি সূর্য্যোদয়, আলো এনেছে তারা, পূজা করেছি তখন। অনেক দেখেছি ইতর নোংরা নিন্দুক, অনেক দেখেছি কৃপণ কুৎসিত। সব বাদ দিয়ে সব মেনে নিয়ে তবু অনেক বাকি থাকে। সেই বাকিদেরই দেখেছি উজ্জ্বল আলোয়। তাদের অনেকের নাম থাকবে না কারো মনে, তবু তারা বড়ো।”

“এলী, তোমার কথা শুনে লজ্জা করছে, মনে হচ্চে একটা প্রতিবাদ না করলে ভালো শোনাবে না। তবু ভালোও লাগছে। কিন্তু সত্য কথায় তোমার কাছে হার মানতে পারব না। আমাদের দেশের পুরুষদের যে-কাপুরুষতার লক্ষণ ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, যার কথা আমাকে বারবার ভাবিয়েছে সে আমি আজ তোমার কাছে বল্‌ব।

আমি দেখেছি আমার জানা পরিবারের মধ্যে এবং আমার নিজের পরিবারেও শাশুড়ির অসহ্য অন্যায় আধিপত্য। শাশুড়ির অত্যাচারের কথা চিরকাল এদেশে প্রচলিত।”—

“হাঁ সে তো জানি। নিজের ঘরে দেখেছি, যে-মানুষ হাড়ে দুর্ব্বল, দুর্ব্বলের যম সে—তার মতো নিষ্ঠুর কেউ হোতে পারে না।”

“এলা, ওকথা ব’লে তুমি তোমার ভাবী শাশুড়ির নিন্দার ভূমিকা করে রেখো না। নববধূর ’পরে অমানুষিক অত্যাচারের খবর প্রায় শুনতে পাই, আর দেখি তার প্রধান নায়িকা শাশুড়ি। কিন্তু শাশুড়িকে অপ্রতিহত অন্যায় করবার অধিকার দিয়েছে কে? সে তো ঐ মায়ের খোকারা! অত্যাচারিণীর বিরুদ্ধে নিজের স্ত্রীর সম্ভ্রম রাখবার শক্তি নেই যাদের সেই নাবালকদের কখনোই কি বিয়ে করবার বয়স হয়? যখন হয় তখন তারা স্ত্রীর খোকা হয়ে ওঠে। যেখানে পুরুষের পৌরুষ দুর্ব্বল সেখানেই মেয়েরা নেবে আসে আর নাবায় নীচতার দিকে। আজ দেখি আমাদের দেশে যারা বড়ো-কিছু করবার সংকল্প করে তারা মেয়েকে ত্যাগ করতে চায়—মেয়েকে ভয় করে সেই

স্ত্রৈণ কাপুরুষেরা। সেইজন্যেই এই কাপুরুষের দেশে তুমি পণ করেছ বিয়ে করবে না, পাছে কোনো কচি মন বেঁকে যায় তোমার মেয়েলি প্রভাবে। যথার্থ পুরুষ যারা, তারা যথার্থ মেয়ের জোরেই চরিতার্থ হবে—বিধাতার নিজের হাতের এই হুকুমনামা আছে আমাদের রক্তে। যে সেই বিধিলিপিকে ব্যর্থ করে সে পুরুষনামের যোগ্য নয়। পরীক্ষার ভার ছিল তোমার হাতে, আমাকে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লে না কেন?"

"অস্তু, তর্ক করতে পারতুম কিন্তু তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। কেন না, জানি তুমি নিতান্ত ক্ষোভের মুখে এই সব কুযুক্তি পেড়েছ। আমার পণের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছ না।"

"না ভুলতে পারব না। তুমি বল্‌লে কি না, পুরুষরা মস্ত বড়ো, মেয়েরা তাদের ছোটো করবে এই তোমার ভয়! মেয়েদের বড়ো হবার দরকারই হয় না। তারা যতটুকু ততটুকুই সুসম্পূর্ণ। হতভাগা যে-পুরুষ বড়ো নয় সে অসম্পূর্ণ, তার জন্যে সৃষ্টিকর্ত্তা লজ্জিত।"

"অস্তু, সেই অসম্পূর্ণের মধ্যেও আমরা বিধাতার ইচ্ছাটা দেখতে পাই,—সেটা বড়ো ইচ্ছা।"

"এলী, বিধাতার ইচ্ছাটাই যে বড়ো তা বল্‌তে পারিনে, তাঁর কল্পনাটাও কোনো অংশে ছোটো নয়। সেই কল্পনার তুলির ছোঁওয়ায় জাদু লেগেছে মেয়েদের প্রকৃতিতে, তারা সংসারের ক্ষেত্রে এনেছে আর্টিষ্টের সাধনা, রঙে সুরে আপন দেহে মনে প্রাণে অনির্ব্বচনীয়কে প্রকাশ করছে। এটা সহজ শক্তির কর্ম্ম, সেইজন্মেই এটা সহজ নয়। ঐ যে তোমার শাঁখের মতো চিকন রঙের কণ্ঠে সোনার হারটি দেখা দিয়েছে ওর জন্মে তোমাকে নোট বই মুখস্থ করতে হয়নি। আপনার জীবনলোকে রূপের সৃষ্টিতে রস জাগাতে পারল না, এমন হত-ভাগিনী আছে, মোটা সোনার বালা প'রে গিন্নিপনা করে সেই মুখরা; নয়তো দাসী হয়ে জীবন কাটায় উঠোন নিকিয়ে। সংসারে এই সব অকিঞ্চিৎকরের সীমা সংখ্যা নেই।"

"সৃষ্টিকর্ত্তাকেই দোষ দেব অন্তু। লড়াই করবার শক্তি কেন দেননি মেয়েদের? বঞ্চনা ক'রে কেন তাদের আপনাকে বাঁচাতে হয়? পৃথিবীতে সব চেয়ে জঘন্য যে স্পাইয়ের ব্যবসা সেই ব্যবসাতে মেয়েদের নৈপুণ্য পুরুষের চেয়ে বেশি একথা যখন বইয়ে পড়লুম তখন বিধাতার পায়ে মাথা ঠুকে বলেছি সাতজন্মে যেন

মেয়ে হয়ে না জন্মাই। আমি মেয়ের চোখে দেখেছি পুরুষকে, তাই সব কাটিয়ে তাদের ভালোকে দেখতে পেয়েছি, তাদের বড়োকে। যখন দেশের কথা ভাবি তখন সেই সব সোনার টুক্‌রো ছেলেদের কথাই ভাবি, আমার দেশ তারাই। তারা ভুল যদি করে, খুব বড়ো করেই ভুল করে। আমার বুক ফেটে যায় যখন ভাবি আপন ঘরে এরা জায়গা পেল না। আমি ওদেরই মা, ওদেরই বোন, ওদেরই মেয়ে—এই কথা মনে ক'রে বুক ভ'রে ওঠে আমার। নিজেকে সেবিকা বল্‌তে ইংরেজি-পড়া মেয়েদের মুখে বাধে—কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয় ব'লে ওঠে আমি সেবিকা, তোমাদের সেবা করা আমার সার্থকতা। আমাদের ভালোবাসার চরম এই ভক্তিতে।"

"ভালোই তো; তোমার সেই ভক্তির জন্যে অনেক পুরুষ আছে, কিন্তু আমাকে কেন? ভক্তি না হোলেও আমার চলবে। মেয়েদের সম্বন্ধের যে ফর্দ্দটা তুমি দিলে, মা বোন মেয়ে, তার মধ্যে প্রধান একটা বাদ পড়ে গেল, আমারি কপাল দোষে।"

"তোমার নিজের চেয়ে তোমাকে আমি বেশি জানি অন্ত। আমার আদরের ছোটো খাঁচায় দুদিনে

তোমার ডানা উঠ্‌ত ছট্‌ফটিয়ে। যে তৃপ্তির সামান্য উপকরণ আমাদের হাতে, তার আয়োজন তোমার কাছে একদিন ঠেক্‌ত তলানিতে এসে। তখন জানতে পারতে আমি কতই গরীব। তাই আমার সমস্ত দাবী তুলে নিয়েছি, সম্পূর্ণ মনে সঁপে দিয়েছি তোমাকে দেশের হাতে। সেখানে তোমার শক্তি স্থান-সঙ্কোচে দুঃখ পাবে না।”

অত্যন্ত ব্যথার জায়গায় যেন ঘা লাগল, জ্বলে উঠল অতীনের দুই চোখ। পায়চারি ক'রে এলো ঘরের এধার থেকে ওধারে। তারপরে এলার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, “তোমাকে শক্ত কথা বলবার সময় এসেছে। জিজ্ঞাসা করি দেশের কাছেই হোক্ যার কাছেই হোক্ তুমি আমাকে সঁপে দেবার কে? তুমি সঁপে দিতে পারতে মাধুর্য্যের দান, যা তোমার যথার্থ আপন সামগ্রী। তাকে সেবা বলো তো তাই বলো, বরদান বলো যদি তাও বলতে পারো; অহঙ্কার করতে যদি দাও তো করব অহঙ্কার, নম্র হয়ে যদি আসতে বলো দ্বারে তবে তাও আসতে পারি। কিন্তু তোমার আপন দানের অধিকারকে আজ দেখ্‌ছ তুমি ছোটো ক'রে। নারীর মহিমায় অন্তরের ঐশ্বর্য্য যা

তুমি দিতে পারতে, তা সরিয়ে নিয়ে তুমি বলছ—দেশকে দিলে আমার হাতে। পারো না দিতে, পারো না, কেউ পারে না। দেশ নিয়ে এক হাত থেকে আর এক হাতে নাড়ানাড়ি চলে না।”

বিবর্ণ হয়ে এলো এলার মুখ। বল্‌লে, “কী বল্‌ছ, ভালো বুঝতে পারছিনে।”

“আমি বলছি নারীকে কেন্দ্র ক’রে যে-মাধুর্য্যলোক বিস্তৃত, তার প্রসার যদি বা দেখতে হয় ছোটো, অন্তরে তার গভীরতার সীমা নেই,—সে খাঁচা নয়। কিন্তু দেশ উপাধি দিয়ে যার মধ্যে আমার বাসা নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছিলে তোমাদের দলের বানানো দেশে—অন্যের পক্ষে যাই হোক আমার স্বভাবের পক্ষে সেই তো খাঁচা। আমার আপন শক্তি তার মধ্যে সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না ব’লেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, বিকৃতি ঘটে তার, যা তার যথার্থ আপন নয় তাকেই ব্যক্ত করতে গিয়ে পাগ্‌লামি করে, লজ্জা পাই, অথচ বেরোবার দরজা বন্ধ। জানো না, আমার ডানা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে, দুই পায়ে আঁট হয়ে লেগেছে বেড়ি। আপন দেশে আপন স্থান নেবার দায় ছিল আপন শক্তিতেই, সে শক্তি আমার ছিল। কেন তুমি আমাকে সে কথা ভুলিয়ে দিলে?”

ক্লিষ্টকণ্ঠে এলা বল্‌লে, "তুমি ভুল্‌লে কেন, অন্তু?"

"ভোলাবার শক্তি তোমাদের অমোঘ, নইলে ভুলেছি ব'লে লজ্জা করতুম। আমি হাজারবার ক'রে মান্‌ব যে, তুমি আমাকে ভোলাতে পারো, যদি না ভুলতুম, সন্দেহ করতুম আমার পৌরুষকে।"

"তাই যদি হয় তবে আমাকে ভর্ৎসনা করছ কেন?"

"কেন? সেই কথাটাই বলছি। ভুলিয়ে তুমি সেইখানেই নিয়ে যাও যেখানে তোমার আপন বিশ্ব, আপন অধিকার। দলের লোকের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বল্‌লে, জগতে একটিমাত্র কর্ত্তব্যের পথ বেঁধে দিয়েছ তোমরা ক'জনে। তোমাদের সেই শান-বাঁধানো সরকারী কর্ত্তব্যপথে ঘুর খেয়ে কেবলি ঘুলিয়ে উঠছে আমার জীবনস্রোত।"

"সরকারী কর্ত্তব্য?"

"হাঁ তোমাদের স্বদেশী কর্ত্তব্যের জগন্নাথের রথ। মন্ত্রদাতা বল্‌লেন, সকলে মিলে একখানা মোটা দড়ি কাঁধে নিয়ে টানতে থাকো দুই চক্ষু বুজে—এই একমাত্র কাজ। হাজার হাজার ছেলে কোমর বেঁধে ধর্‌ল দড়ি। কত পড়ল চাকার তলায়, কত হোলো চিরজন্মের মতো

পঙ্গু। এমন সময় লাগল মন্ত্র উল্টো রথের যাত্রায়। ফিরল রথ। যাদের হাড় ভেঙেছে তাদের হাড় জোড়া লাগবে না, পঙ্গুর দলকে ঝাঁটিয়ে ফেল্‌লে পথের ধূলোর গাদায়। আপন শক্তির 'পরে বিশ্বাসকে গোড়াতেই এমনি ক'রে ঘুচিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, সবাই সরকারী পুতুলের ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করতে দিতে স্পর্দ্ধা করেই রাজি হোলো। সর্দ্দারের দড়ির টানে সবাই যখন একই নাচ নাচতে সুরু করলে, আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলে—এ'কেই বলে শক্তির নাচ। নাচনওয়ালা যেই একটু আল্‌গা দেয়, বাতিল হয়ে যায় হাজার হাজার মানুষ-পুতুল।"

"অন্তু, ওদের অনেকেই যে পাগলামি ক'রে পা ফেলতে লাগল, তাল রাখতে পারলে না।"

"গোড়াতেই জানা উচিত ছিল মানুষ বেশিক্ষণ পুতুল-নাচ নাচতে পারে না। মানুষের স্বভাবকে হয় তো সংস্কার করতে পারো, তাতে সময় লাগে। স্বভাবকে মেরে ফেলে মানুষকে পুতুল বানালে কাজ সহজ হয় মনে করা ভুল। মানুষকে আত্মশক্তির বৈচিত্র্যবান জীব মনে করলেই সত্য মনে করা হয়। আমাকে সেই জীব ব'লে শ্রদ্ধা যদি করতে

তাহোলে আমাকে দলে তোমার টানতে না, বুকে টানতে।"

"অন্তু, গোড়াতেই কেন আমাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলে না? কেন আমাকে অপরাধী করলে?"

"সে তো তোমাকে বারবার বলেছি। তোমার সঙ্গে মিলতে চেয়েছিলুম, এইটে অত্যন্ত সহজ কথা। দুর্জ্জয় সেই লোভ। প্রচলিত পথটা ছিল বন্ধ। মরীয়া হয়ে জীবন পণ করলুম বাঁকা পথে। তুমি মুগ্ধ হোলে। আজ জেনেছি আমাকে মরতে হবে এই রাস্তায়। সেই মরাটা চুকে গেলে তুমি আমাকে দু'হাত বাড়িয়ে ফিরে ডাক্‌বে—ডাক্‌বে তোমার শূন্য বুকের কাছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।"

"পায়ে পড়ি, অমন ক'রে বোলো না।"

"বোকার মতো বলছি, রোমান্টিক্ শোনাচ্চে। যেন দেহহীন বস্তুহীন পাওয়াকে পাওয়া বলে। যেন তোমার সেদিনকার বিরহ আজকের দিনের প্রতিহত মিলনের এক কড়াও দাম শোধ করতে পারে!"

"আজ তোমাকে কথায় পেয়েছে, অন্তু।"

"কী বলছ! আজ পেয়েছে! চিরকাল পেয়েছে। যখন আমার বয়স অল্প, ভালো করে মুখ ফোটেনি,

তখন সেই মৌনের অন্ধকারের ভিতর থেকে কথা ফুটে ফুটে উঠছিল, কত উপমা কত তুলনা, কত অসংলগ্ন বাণী। বয়স হোলো, সাহিত্যলোকে প্রবেশ করলুম, দেখলুম ইতিহাসের পথে পথে রাজ্য সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপ, দেখলুম বীরের রণসজ্জা পড়ে আছে ভেঙে, বিদীর্ণ জয়স্তম্ভের ফাটলে উঠেছে অশথ গাছ; বহু শতাব্দীর বহু প্রয়াস ধূলার স্তূপে স্তব্ধ। কালের সেই আবর্জ্জনা-রাশির সর্ব্বোচ্চে দেখলুম অটল বাণীর সিংহাসন। সেই সিংহাসনের পায়ের কাছে যুগযুগান্তরের তরঙ্গ পড়ছে লুটিয়ে লুটিয়ে। কতদিন কল্পনা করেছি সেই সিংহাসনের সোনার স্তম্ভে অলঙ্কার রচনা করবার ভার নিয়ে এসেছি আমিও। তোমার অন্তু চিরদিন কথায়-পাওয়া মানুষ। তাকে কোনোদিন ঠিকমতো চিনবে সে আশা আর রইল না—তাকে কি না ভর্ত্তি ক'রে নিলে দলের সতরঞ্চ খেলায় ব'ড়ের মধ্যে !"

এলা চৌকি থেকে নেমে প'ড়ে অতীনের পায়ের উপর মাথা রাখলে। অতীন তাকে টেনে তুলে পাশে বসালে। বল্‌লে, "তোমার এই ছিপ্‌ছিপে দেহখানিকে কথা দিয়ে দিয়েই মনে মনে সাজিয়েছি, তুমি আমার সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা, তুমি আমার

সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা। আমার চারিদিকে আছে অদৃশ্য আবরণ, বাণীর আবরণ, সাহিত্যের অমরাবতী থেকে নেমে এসে ভিড় ঠেকিয়ে রাখে তারা। আমি চিরস্বতন্ত্র, সে কথা জানেন তোমাদের মাষ্টারমশায়, তবু আমাকে বিশ্বাস করেন কেন ?"

"সেইজন্যেই বিশ্বাস করেন। সবার সঙ্গে মিলতে হোলে সবার মধ্যে নাবতে হয় তোমাকে। তুমি কিছুতেই নাবতে পারো না। তোমার 'পরে আমার বিশ্বাস সেই জন্যেই। কোনো মেয়ে কোনো পুরুষকে এত বিশ্বাস করতে পারে নি। তুমি যদি সাধারণ পুরুষ হোতে তাহোলে সাধারণ মেয়ের মতোই আমি তোমাকে ভয় করতুম। নির্ভয় তোমার সঙ্গ।"

"ধিক্ সেই নির্ভয়কে। ভয় করলেই পুরুষকে উপলব্ধি করতে। দেশের জন্যে দুঃসাহস দাবী করো, তোমার মতো মহীয়সীর জন্যে করবে না কেন ? কাপুরুষ আমি। অসম্মতির নিষেধ ভেদ ক'রে কেন তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারিনি বহুপূর্ব্বে যখন সময় হাতে ছিল ? ভদ্রতা ! ভালোবাসা তো বর্ব্বর ! তার বর্ব্বরতা পাথর ঠেলে পথ করবার জন্যে। পাগ্‌লা-ঝোরা সে, ভদ্রসহরের পোষ-মানা কলের জল নয়।"

এলা দ্রুত উঠে পড়ে বল্‌লে, "চলো অন্তু, ঘরে চলো।"

অতীন উঠে দাঁড়াল, বল্‌লে "ভয়! এতদিন পরে সুরু হোলো ভয়। জিৎ হোলো আমার। যৌবন যখন প্রথম এসেছিল তখনো মেয়েদের চিনিনি। কল্পনায় তাদের দুর্গম দূরে রেখে দেখেছি; প্রমাণ করবার সময় বয়ে গেল যে, তোমরা যা চাও তাই আমি। অন্তরে আমি পুরুষ, আমি বর্ব্বর উদ্দাম। সময় যদি না হারাতুম এখনি তোমাকে বজ্রবন্ধনে চেপে ধরতুম, তোমার পাঁজরের হাড় টনটন করে উঠ্‌ত; তোমাকে ভাববার সময় দিতুম না, কাঁদবার মতো নিশ্বাস তোমার বাকি থাকত না, নিষ্ঠুরের মতো টেনে নিয়ে যেতুম আপন কক্ষপথে। আজ যে-পথে এসে পড়েছি এ পথ ক্ষুরধারার মতো সঙ্কীর্ণ, এখানে দুজনে পাশাপাশি চলবার জায়গা নেই।"

"দস্যু আমার, কেড়ে নিতে হবে না গো, নাও, এই নাও, এই নাও।" এই ব'লে দু'হাত বাড়িয়ে গেল অতীনের কাছে, চোখ বুজে তার বুকের উপর প'ড়ে তার মুখের দিকে মুখ তুলে ধরলে।

জানলা থেকে এলা রাস্তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ব'লে উঠল, "সর্ব্বনাশ! ঐ দেখতে পাচ্ছ?"

"কী বলো দেখি ?"

"ঐ যে রাস্তার মোড়ে। নিশ্চয় বটু—এখানেই আসছে।"

"আসবার যোগ্য জায়গা সে চেনে।"

"ওকে দেখলে আমার সমস্ত শরীর সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। ওর স্বভাবে অনেকখানি মাংস, অনেকখানি ক্লেদ। যত চেষ্টা করি পাশ কাটিয়ে চল্‌তে, ওকে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে, ততই ও কাছে এসে পড়ে। অশুচি, অশুচি ঐ মানুষটা।"

"আমিও ওকে সহ্য করতে পারি নে এলা।"

"ওর সম্বন্ধে অন্যায় কল্পনা করছি ব'লে নিজেকে শান্ত করবার অনেক চেষ্টা করি—কোনোমতেই পারি নে। ওর ড্যাবা ড্যাবা চোখ ছুটো দূরের থেকে লালায়িত স্পর্শে যেন আমার অপমান করে।"

"ওর প্রতি ভ্রূক্ষেপ কোরো না এলা। মনে মনে ওর অস্তিত্বকে একেবারে উপেক্ষা করতে পারো না ?"

"ওকে ভয় করি ব'লেই মন থেকে সরাতে পারি নে। ওর একটা ভিতরকার চেহারা দেখতে পাই কুৎসিত অক্টোপস্ জন্তুর মতো। মনে হয় ও আপনার অন্তর থেকে আট্‌টা চট্‌চটে পা বের ক'রে আমাকে

একদিন অসম্মানে ঘিরে ফেলবে—কেবলি তারি চক্রান্ত করছে। এ'কে তুমি আমার অবুঝ মেয়েলি আশঙ্কা ব'লে হেসে উড়িয়ে দিতে পারো, কিন্তু এই ভয়টা ভূতে-পাওয়ার মতো আমাকে পেয়েছে। শুধু আমার জন্যে নয়, তোমার জন্যে আমার আরও ভয় হয়, আমি জানি তোমার দিকে ওর ঈর্ষ্যা সাপের ফণার মতো ফোঁস্ ফোঁস্ করছে।"

"এলা ওর মতো জন্তুদের সাহস নেই, আছে দুর্গন্ধ, তাই কেউ ওদের ঘাঁটাতে চায় না। কিন্তু আমাকে ও সর্ব্বান্তঃকরণে ভয় করে, আমি ভয়ঙ্কর ব'লে যে তা নয়, আমি ওর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতীয় ব'লে।"

"দেখো অন্তু, জীবনে অনেক দুঃখ বিপদের সম্ভাবনা আমি ভেবেছি, তার জন্যে প্রস্তুতও আছি কিন্তু একদিন কোনো দুর্য্যোগে যেন ওর কবলে না পড়ি, তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।" অন্তুর হাত চেপে ধরলে, যেন এখনি উদ্ধার করবার সময় হয়েছে।

"জানো অন্তু, হিংস্র জন্তুর হাতে অপমৃত্যুর কল্পনা কখনো কখনো মনে আসে, তখন দেবতাকে জানাই, বাঘে খায় ভালুকে খায় সেও ভালো, কিন্তু আমাকে

পাঁকের মধ্যে টেনে নিয়ে কুমীরে খাবে—এ যেন কিছুতে না ঘটে।”

“আমি কি বাঘ ভালুকের কোঠায় না কি ?”

“না গো, তুমি আমার নরসিংহ, তোমার হাতে মরণেই আমার মুক্তি। ঐ শোনো পায়ের শব্দ। উপরে উঠে এলো ব’লে।”

অতীন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে জোর গলায় বল্‌লে, “বটু, এখানে নয়, চলো নীচে বসবার ঘরে।”

বটু বল্‌লে, “এলা-দি—”

“এলা-দি এখন কাপড় ছাড়তে গেলেন, চলো নীচে।”

“কাপড় ছাড়তে ? এত দেরিতে ? সাড়ে আট্‌টা—”

“হাঁ, হাঁ, আমিই দেরি করিয়ে দিয়েছি।”

“কেবল একটা কথা। পাঁচ মিনিট।”

“তিনি স্নানের ঘরে গেছেন। বলে গেছেন, এ ঘরে কেউ আসে তাঁর ইচ্ছে নয়।”

“আপনি ?”

“আমি ছাড়া।”

বটু খুব স্পষ্ট একটা ঠোঁটবাঁকা হাসি হাস্‌লে। বল্‌লে, “আমরা চিরকাল রইলুম ব্যাকরণের সাধারণ

নিয়মে, আর আপনি দুদিন এসেই উঠে পড়েছেন আর্ষপ্রয়োগে। এক্‌সেপ্‌শন্‌ পিছল পথের প্রশ্রয়, বেশিকাল সয় না ব'লে রেখে দিলুম।"—ব'লে তর্‌ তর্‌ ক'রে নেমে চলে গেল।

ছোটো একটা করাৎ হাতে দোলাতে দোলাতে অখিল এসে বল্‌লে,—"চিঠি"। ওর অসমাপ্ত সৃষ্টিকাজের মাঝখান থেকে উঠে এসেছে।

"তোমার দিদিমণির ?"

"না আপনার। আপনারি হাতে দিতে বল্‌লে।"

"কে ?"

"চিনিনে।" ব'লেই চিঠিখানা দিয়ে চলে গেল। চিঠির কাগজের লাল রং দেখেই অতীন বুঝ্‌লে, এটা ডেন্‌জর্‌ সিগ্‌ন্যাল্‌। গোপন ভাষায় লেখা চিঠি প'ড়ে দেখলে:—"এলার বাড়িতে আর নয়, তাকে কিছু না জানিয়ে এই মুহূর্ত্তে চলে এসো।"

কর্ম্মের যে-শাসন স্বীকার ক'রে নিয়েছে তাকে অসম্মান করাকে অতীন আত্মসম্মানের বিরুদ্ধ ব'লেই জানে। চিঠিখানা যথারীতি কুটিকুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌লে। মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল রুদ্ধ নাবার ঘরের বাইরে। পরক্ষণে দ্রুতবেগে গেল বেরিয়ে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে একবার দোতলার দিকে তাকালে। জানলা খোলা, বাইরে থেকে দেখা যায় আরাম-কেদারার একটা অংশ, আর তার সঙ্গে সংলগ্ন লালেতে হল্‌দেতে ডোরা-কাটা চৌকো বালিশের এক কোণা। লাফ দিয়ে অতীন চল্‌তি ট্রাম গাড়িতে চড়ে বস্‌ল।

তৃতীয় অধ্যায়

গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি ফিকে-সবুজ গাঢ়-সবুজ হল্‌দে-সবুজ ব্রাউন-সবুজ রঙের গুল্মে বনস্পতিতে জড়িত নিবিড়তা, বাঁশপাতা-পচা পাঁকের স্তরে ভ'রে-ওঠা ডোবা ; তারি পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা গলি, গোরুর গাড়ির চাকায় বিক্ষত। ওল, কচু, ঘেঁটু, মনসা, মাঝে মাঝে আস্‌সেওড়ার বেড়া। ক্বচিৎ ফাঁকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় আল দিয়ে বাঁধা কচিধানের ক্ষেতে জল দাঁড়িয়েছে। গলি শেষ হয়েছে গঙ্গার ঘাটে। সেকালের ছোটো ছোটো ইঁট দিয়ে গাঁথা ভাঙা ফাটা ঘাট কাৎ হয়ে পড়েছে, তলায় চর প'ড়ে গঙ্গা গেছে স'রে, কিছুদূরে তীরে ঘাট পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা পুরোনো ভাঙা বাড়ির অভিশপ্ত ছায়ায় দেড়শো বছর আগেকার মাতৃহত্যা-পাতকীর ভূত আশ্রয় নিয়েছে ব'লে জনপ্রবাদ। অনেককাল কোনো সজীব স্বত্বাধিকারী সেই অশরীরীর বিরুদ্ধে আপন দাবী স্থাপনের চেষ্টামাত্র করেনি। দৃশ্যটা এইখানকার পরিত্যক্ত পুরোনো পুজোর দালান, তার সামনে

শ্যাওলা-পড়া রাবিশে এবড়ো খেবড়ো প্রশস্ত আঙিনা। কিছুদূরে নদীর ধারে ভেঙেপড়া দেউল, ভাঙা রাসমঞ্চ, প্রাচীন প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, ডাঙায় তোলা পাঁজর বের-করা ভাঙা নৌকো ঝুরি-নামা বটগাছের অন্ধকার তলায়।

এইখানে দিনের শেষ প্রহরে অতীনের বর্ত্তমান বাসস্থানে ছায়াচ্ছন্ন দালানে প্রবেশ করল কানাই গুপ্ত। চমকে উঠল অতীন, কেমনা এখানকার ঠিকানা কানাইয়েরও জানবার কথা ছিল না।

"আপনি যে!"

কানাই বল্‌লে, "গোয়েন্দাগিরিতে বেরিয়েছি।"

"ঠাট্টাটা বুঝিয়ে দেবেন।"

"ঠাট্টা নয়। আমি তোমাদের রসদ-জোগানদার-দের সামান্য একজন। চায়ের দোকানে শনি প্রবেশ করলে; বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল ওদের কুদৃষ্টি। শেষকালে ওদেরি গোয়েন্দার খাতায় নাম লিখিয়ে এলুম। নিমতলা ঘাটের রাস্তা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই যাদের সামনে, তাদের পক্ষে এটা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক্ রোড্, দেশের বুকের উপর দিয়ে পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম পর্য্যন্ত বরাবর লম্বমান।"

"চা বানানো ছেড়ে খবর বানাচ্ছেন ?"

"বানালে এ ব্যবসা চলে না। বিশুদ্ধ খাঁটি খবরই দিতে হয়। যে-শিকার জালে পড়েইছে আমি তার ফাঁস টেনে দিই। তোমাদের হরেনের সাড়ে পনেরো আনা খবর ওদের কাছে পৌঁছল, শেষ বাহুল্য খবরটা আমি দিয়েছি। সে এখন জলপাইগুড়িতে সরকারী ধর্ম্মশালায়।"

"এবার বুঝি আমার পালা ?"

"ঘনিয়ে এসেছে। কাজ অনেকখানি এগিয়ে এনেছে বটু। আমার অংশে যেটুকু পড়ল তাতে কিছু সময় পাবে। সাবেক বাসায় থাক্‌তে হঠাৎ তোমার ডায়ারি হারিয়েছিল। মনে আছে ?"

"খুব মনে আছে।"

"সেটা পুলিশের হাতে নিশ্চিত পড়ত, কাজেই আমাকেই চুরি করতে হোলো।"

"আপনি !"

"হাঁ, সাধু যার সঙ্কল্প ভগবান তার সহায়। একদিন সেটা লিখছিলে, আমারই কৌশলে সরে গেলে পাঁচ মিনিটের জন্যে। সেই সময়ে সরিয়েছি।"

অতীন মাথায় হাত দিয়ে বল্‌লে, "সবটা পড়েছেন ?"

"নিশ্চিত পড়েছি। পড়্‌তে পড়্‌তে রাত হয়ে গেল দেড়টা। বাংলা ভাষায় এত তেজ এত রস তা আগে জানতুম না। ওর মধ্যে গোপনীয় কথা আছে বই কী। কিন্তু সেটা ব্রিটিশসাম্রাজ্য সম্পর্কে নয়।"

"কাজটা কি ভালো করেছেন ?"

"কত ভালো করেছি তা বলতে পারিনে। তুমি সাহিত্যিক, তুমি সমস্ত খাতায় খুঁটিনাটি কথা কিছু লেখোনি, কারো নাম পর্য্যন্ত নেই। কেবল ভাবের দিক থেকে এত ঘৃণা এত অশ্রদ্ধা, যে, তা কোনো পেন্সন-ভোগী মন্ত্রীপদপ্রার্থীর কলম দিয়ে বেরোলে রাজদরবারে তার মোক্ষলাভ হোতো। বটু যদি তোমার সঙ্গে না লাগত তা হোলে ঐ খাতাখানাই তোমার গ্রহ স্বস্ত্যয়নের কাজ করত।"

"বলেন কী! সবটাই পড়েছেন ?"

"পড়েছি বৈ কী। কী বল্‌ব বাবাজি, আমার যদি মেয়ে থাকত আর এমন লেখা যদি সে তোমার কলম থেকে বের করতে পারত তা হোলে সার্থক মানতুম আপন পিতৃপদকে। সত্যি কথা বলি, তোমাকে দলে জড়িয়ে ইন্দ্রনাথ ভায়া দেশের লোকসান করেছেন।"

"আপনার এই ব্যবসার কথা দলের সবাই জানে ?"

"কেউ না।"

"মাষ্টারমশায় ?"

"বুদ্ধিমান, আন্দাজ করতে পারেন কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন নি, শোনেন নি আমার মুখ থেকে।"

"আমাকে বল্‌লেন যে !"

"এইটেই আশ্চর্য্য কথা। আমার মতো সন্দেহজীবী মানুষ কাউকে যদি বিশ্বাস না করতে পারে তাহোলে দম আটকে মরে। আমি ভাবুক নই, বোকাও নই, তাই ডায়ারি রাখিনে, যদি রাখতুম তোমার হাতে দিতে পারলে মন খোলসা হোতো।"

"মাষ্টার মশায়—"

"মাষ্টার মশায়ের কাছে খবর দেওয়া চলে কিন্তু মন খোলা চলে না। ইন্দ্রনাথের প্রধান মন্ত্রী আমি, কিন্তু তার সব কথা আমি যে জানি তা মনেও কোরো না। এমন কথা আছে যা আন্দাজ করতেও সাহস হয় না। আমার বিশ্বাস, আমাদের দলের যারা আপনি ঝরে পড়ে, ইন্দ্রনাথ আমার মতোই তাদের ঝেঁটিয়ে ফেলে পুলিসের পাঁশতলায়। কাজটা গর্হিত কিন্তু নিষ্পাপ। ব'লে রাখ্‌ছি, একদিন ওরি বা আমারি সাহায্যে তোমার হাতে শেষ হাতকড়ি পড়বে, তখন কিছু মনে

কোরো না যেন। তোমার এ বাড়িতে আসার খবর বটুই প্রথম থানার কানাকানি-বিভাগে জানিয়েছে। কাজেই আমাকে টেক্কা দিতে হোলো, ফোটোগ্রাফ তুলে ওদের কাছে দিয়েছি। এখন কাজের কথা বলি। চব্বিশ ঘণ্টা তোমাকে সময় দিচ্চি, তার পরেও যদি এখানে থাকো তা হোলে আমিই তোমাকে থানার পথে এগিয়ে দেব। এখান থেকে কোথায় যেতে হবে সবিস্তারে তার রাস্তাঘাট এই লিখে দিয়েছি—এর অক্ষর তোমার জানা আছে, তবু মুখস্থ করেই ছিঁড়ে ফেলো। এই দেখো ম্যাপ। রাস্তার এ পাশে তোমার বাসা, ইস্কুল বাড়ির কোণের ঘরে। ঠিক সামনে পুলিশের থানা। সেখানে আছে আমার কোনো এক সম্পর্কে নাতি, রাইটর্ কনষ্টেবল্, তাকে রাঘব বোয়াল বলি। তিনপুরুষে পশ্চিমে বাস। বাংলা পড়াবার মাষ্টারি পেয়েছ তুমি। সেখানে গেলেই রাঘব তোমার তোরঙ্গ ঘাঁটবে, পকেট ঝাড়া দেবে, গুঁতোগাঁতাও দিতে পারে। সেইটেকেই ভগবানের দয়া ব'লে মনে কোরো। বাঙালী মাত্রই যে শ্যালকসম্প্রদায়ভুক্ত এই তত্ত্বটি রঘুবীরের হিন্দীভাষায় সর্ব্বদাই প্রকাশ পেয়ে থাকে। তুমি তার কোনো প্রকার রূঢ় প্রতিবাদের চেষ্টামাত্র কোরো না,

প্রাণ থাকতে এ দেশে ফিরে এসো না। বাইসিক্‌ল্‌টা রইল বাইরে। ইসারা যখনি পাবে সেই মুহূর্ত্তে চ'ড়ে বোসো। এসো বাবাজি, শেষ দিনের মতো কোলাকুলি করে নিই।"—কোলাকুলি হয়ে গেলে চলে গেল কানাই।

অতীন চুপ করে বসে রইল। তাকিয়ে দেখতে লাগল অন্তরের দিকে। অকালে এসে পড়ল তার জীবনের শেষ অঙ্ক, যবনিকা আসন্ন পতনমুখী, দীপ নিবে এসেছে। যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল নির্ম্মল ভোরের আলোয়; সেখান থেকে আজ অনেক দূরে এসে পড়েছে। পথে পা বাড়াবার সময় যে পাথেয় হাতে ছিল, তার কিছুই বাকী নেই; পথের শেষ ভাগে নিজেকে কেবলি ঠকিয়ে খেয়েছে; একদিন হঠাৎ পথের একটা বাঁকের মুখে সৌন্দর্য্যের যে আশ্চর্য্য দান নিয়ে ভাগ্যলক্ষ্মী তার সামনে দাঁড়িয়েছিল সে যেন অলৌকিক; তেমন অপরিসীম ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ হবে ওর জীবনে, সে কথা এর আগে ও কখনোই সম্ভব ব'লে ভাবতে পারেনি, কেবল তার কল্পরূপ দেখেছে কাব্যে ইতিহাসে; বারে-বারে মনে হয়েছে দান্তে বিয়াত্রিচে নূতন জন্ম নিল ওদের দুজনের মধ্যে। সেই ঐতিহাসিক প্রেরণা ওর মনের

ভিতরে কথা কয়েছে, দান্তের মতোই রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের আবর্ত্তের মধ্যে অতীন পড়েছিল ঝাঁপ দিয়ে, কিন্তু তার সত্য কোথায়, বীর্য্য কোথায়, গৌরব কোথায়, দেখতে দেখতে অনিবার্য্য বেগে যে পাঁকের মধ্যে ওকে টেনে নিয়ে এল সেই মুখোষপরা চুরি-ডাকাতি খুনোখুনির অন্ধকারে ইতিহাসের আলোকস্তম্ভ কখনো উঠবে না। আত্মার সর্ব্বনাশ ঘটিয়ে অবশেষে আজ সে দেখছে কোনো যথার্থ ফল নেই এতে, নিঃসংশয় পরাভব সামনে। পরাভবেরও মূল্য আছে কিন্তু আত্মার পরাভবের নয়, যে-পরাভব টেনে আনল গোপনচারী বীভৎস বিভীষিকায়, যার অর্থ নেই ; যার অন্ত নেই।

দিনের আলো ম্লান হয়ে এল। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক উঠেছে প্রাঙ্গণে, কোথায় গোরুর গাড়ি চলেছে তার আর্ত্তস্বর শোনা যায়।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে দ্রুতপদে এসে পড়ল এলা, আত্মহত্যার জন্যে এক ঝোঁকে মানুষ জলে পড়ে যেমন ভাবে তেমনি আলুথালু অন্ধবেগে। অতীন লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠতেই তার বুকের উপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলতে লাগল,"অতীন্, অতীন্, পারলুম না থাকতে।"

অতীন ধীরে ধীরে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে সামনে সরিয়ে ধ'রে ওর অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বল্‌লে, "এলী, কী কাণ্ড করলে তুমি?"

সে বললে, "কিছু জানিনে, কী করেছি।"

"এ ঠিকানা কেমন করে জান্‌লে?"

এলা গভীর অভিমানে বললে, "তোমার ঠিকানা তুমি তো জানাওনি।"

"যে তোমাকে জানিয়েছে সে তোমার বন্ধু নয়।"

"তাও আমি নিশ্চিত জানি কিন্তু তোমার কোনো পথ না জানতে পারলে শূন্যে শূন্যে মন ঘুরে বেড়ায়, অসহ্য হয়ে উঠে। শত্রু মিত্র বিচার করবার মতো অবস্থা আমার নয়। কতকাল তোমাকে দেখিনি বলো দেখি!"

"ধন্য তুমি!"

"তুমি ধন্য অন্ত! যেমনি আমার বাড়িতে আসা নিষেধ হোলো অমনি সেটা তো মেনে নিতে পারলে!"

"ওটা আমার স্বাভাবিক স্পর্দ্ধা। প্রচণ্ড ইচ্ছে আমাকে অজগর সাপের মতো দিনরাত পাক দিয়ে দিয়ে পিষেছিল তবু তাকে মানতে পারলুম না। ওরা আমাকে বলে সেন্টিমেন্টাল, মনে ঠিক করে রেখেছিল

সঙ্কটের সময় প্রমাণ হবে আমি ভিজে মাটিতেই তৈরি। ওরা ভাবতেই পারে না সেন্টিমেন্টেই আমার অমোঘশক্তি।"

"মাষ্টার মশায়ও তা জানেন।"

"এলী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এই ভূতুড়ে পাড়া সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত কোনো বাঙালী ভদ্র-মহিলা এই জায়গাটার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করেনি।"

"তার কারণ, বাংলাদেশের কোনো ভদ্রমহিলার অদৃষ্টে এতবড়ো গরজ এমন দুঃসহ হয়ে কোনোদিন প্রকাশ পায়নি।"

"কিন্তু এলী, আজ তুমি যে কাজ করলে সেটা অবৈধ।"

"জানি সে কথা, মান্‌ব আমার দুর্ব্বলতা, তবু ভাঙব নিয়ম, শুধু নিজের হয়ে না, তোমার হয়েও। প্রতিদিন আমার মন বলেছে তুমি ডাকছ আমাকে। সাড়া দিতে পারিনে ব'লে-যে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে। বলো, আমি এসেছি ব'লে খুসি হয়েছ!"

"এত খুসি হয়েছি যে তা প্রমাণ করবার জন্তে বিপদ স্বীকার করতে রাজি আছি।"

"না, না, তোমার কেন হবে বিপদ! যা হয় তা আমার হোক্। তা হোলে আমি যাই অন্ত।"

"কিছুতেই না। তুমি নিয়ম ভেঙে চলে এসেছ, আমি নিয়ম ভেঙে তোমাকে ধ'রে রাখব। দুজনে মিলে অপরাধ সমান করে নেওয়া যাক। নতুন বিস্ময়ের বসন্তী রঙে একদিন দেখেছিলুম তোমার ঐ মুখ, সে আজ যুগান্তরে পিছিয়ে গেছে। আজ সেই দিনটিকে আবাহন করা যাক্ এই পোড়ো ঘরটার মধ্যে। এসো, আরো কাছে।"

"রোসো, ঘরটা একটুখানি গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করি।"

"হায়রে, টাকের মাথায় চিরুণী চালাবার চেষ্টা!"

এলা একবার চারিদিক ঘুরে দেখলে। মেঝের উপর কম্বল, তার উপর চাটাই। বালিশের বদলে বই দিয়ে ভরা একটা পুরোনো ক্যাম্বিসের থলি। লেখা-পড়া করবার জন্যে একখানা প্যাক্‌বাক্স। কোণে জলের কলসী মাটির ভাঁড় দিয়ে ঢাকা। জীর্ণ চাঙারিতে এক ছড়া কলা, তার মধ্যে এনামেল-উঠে-যাওয়া একখানা বাটি, দৈবাৎ সুযোগ ঘটলে চা খাওয়া চলে। ঘরের অন্য প্রান্তে একটা বড়ো চওড়া সিন্দুক, তার উপরে গণেশের একটি মাটির মূর্ত্তি। তার থেকে প্রমাণ হয় এখানে অতীনের কোনো এক দোসর আছে। এক

থাম থেকে আর এক থাম পর্য্যন্ত দড়ি খাটানো, তাতে নানা রঙের ছোপ-লাগা অনেকগুলো ময়লা গামছা। স্যাঁৎসেতে ঘরে শ্বাসরুদ্ধ আকাশের বাষ্পঘন গন্ধ।

ঠিক এমন না হোক্ এই জাতের দৃশ্য এলা দেখেছে মাঝে মাঝে। কখনো বিশেষ দুঃখ পায়নি, বরঞ্চ ত্যাগ-বীর ছেলেদেরকে মনে মনে বাহাদুরী দিয়েছে। একদা এক জঙ্গলের ধারে দেখেছিল অনিপুণ হাতে রান্নার চেষ্টায় পোড়ো চালের খড়-বাখারি জ্বালানো চুলোর ভস্মাবশেষ; মনে হয়েছিল রাষ্ট্রবিপ্লবী রোমান্সের এ একটা অঙ্গারে আঁকা ছবি। আজ কিন্তু কষ্টে ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। আরামের বাহুবেষ্টনে ঘেরা ধনীর ছেলেকে অবজ্ঞা করাই এলার অভ্যস্ত। কিন্তু অতীনকে এই অপরিচ্ছন্ন মলিন অভাবজীর্ণ অকিঞ্চনতার মধ্যে কিছুতে ওর মন মিশ খাওয়াতে পারে না।

এলার উদ্বিগ্ন মুখ দেখে অতীন হেসে উঠ্‌ল, বল্‌লে, "আমার ঐশ্বর্য্য দেখছ স্তম্ভিত হয়ে। তার যে বিরাট অংশটা দেখা যাচ্চে না, সেইটেতেই তুমি বিস্মিত। আমাদের পা খোলসা রাখতে হয়—দৌড় মারবার সময় মানুষও পিছু ডাকে না, জিনিষ পত্রও না। কিছুদূরে পাটকলের মজুরদের বস্‌তি, তারা আমাকে মাষ্টারবাবু

ব'লে ডাকে। চিঠি পড়িয়ে নেয়, ঠিকানা লিখিয়ে নেয়, বুঝিয়ে নেয় দেনা পাওনার রসিদ ঠিক হোলো কি না। এদের কোনো কোনো সন্তানবৎসলার সখ, ছেলেকে একদিন মজুরশ্রেণী থেকে হজুর শ্রেণীতে ওঠাবে। আমার সাহায্য চায়, ফলফুলুরি দেয় এনে, কারো বা ঘরে গোরু আছে দুধ জুগিয়ে থাকে।”

“অন্তু, কোণে ঐ যে সিন্ধুক আছে ওটা কার সম্পত্তি?”

“অজায়গায় একলা থাকলেই বেশি করে চোখে পড়তে হয়। অলক্ষ্মীর ঝাঁটার মুখে রাস্তার থেকে এসে পড়েছে এই ঘরটাতে—মাড়োয়ারি, তৃতীয় বারকার দেউলে। আমার সন্দেহ হচ্চে দেউলে হওয়াই ওর সর্ব্বপ্রধান ব্যবসা। এই পোড়ো দালানটা ওর দুজন ভাইপোর ট্রেনিং একাডেমি। তারা ভোরবেলায় ছাতু খেয়ে কাজ করতে আসে, বস্তির মেয়েদের জন্যে সস্তাদামের কাপড় রঙায়, বেচে মূলধনের সুদ দেয়, আসলেরও কিছু কিছু শোধ করে। ঐ যে মাটির গামলাগুলো দেখছ, ও আমি আমার যজ্ঞের রান্নায় ব্যবহার করিনে; ওগুলোতে রং গোলা হয়। কাপড়গুলো তুলে রেখে যায় ঐ বাক্সের ভিতর, তা ছাড়া ওতে আছে

বস্তির মেয়েদের প্রসাধনযোগ্য নানা জিনিষ ;— বেলোয়ারি চুড়ি চিরুণী ছোটো আয়না পিতলের বাজু। রক্ষা করবার ভার আমার উপর আর প্রেতাত্মার উপর। বেলা তিনটের সময় সওদা করতে বেরোয়, এখানে আর ফেরে না। কলকাতায় মাড়োয়ারি জানিনে কিসের দালালী করে। আমার ইংরেজি জানার লোভে আমাকে অংশীদার করতে চেয়েছিল, জীবের প্রতি দয়া করে রাজি হইনি। আমার আর্থিক অবস্থারও সন্ধান নেবার চেষ্টা ছিল, বুঝিয়ে দিয়েছি পূর্ব্বপুরুষের ঘরে যা ছিল মজুদ আজ তারি চোদ্দ আনা ওদেরি পূর্ব্বপুরুষের ঘরে জন্মান্তরিত।"

"এখানে তোমার মেয়াদ কতদিনের?"

"আন্দাজ করছি চব্বিশ ঘণ্টা। ঐ আঙিনায় রসে-বিগলিত নানা রঙের লীলা সমানে চলবে দিনের পর দিন, অতীন্দ্র বিলীন হয়ে যাবে পাণ্ডুবর্ণ দূর দিগন্তে। আমার ছোঁয়াচ লেগেছে যে-মাড়োয়ারিকে তাকে বেড়ি-পরা মহামারীতে না পায় এই আমি কামনা করি। এখনো বিনা মূল-ধনে আমার ভাগ্যভাগী হবার সম্ভাবনা যে তার নেই তা বলতে পারিনে।"

"তোমার ভবিষ্যৎ ঠিকানাটা?"

"হুকুম নেই বল্‌বার।"

"তা হোলে কি কল্পনাও করতে পারব না তুমি আছ কোথায়?"

"কল্পনা করতে দোষ কী। মানস সরোবরের তীরটা ভালো জায়গা।"

ইতিমধ্যে ঝুলির ভিতর থেকে বইগুলো বের ক'রে এলা উল্‌টে পাল্‌টে দেখছে। কাব্য, তার কিছু ইংরেজি, আর দুই একখানা বাংলা।

অতীন বললে, "এতদিন ওগুলো বয়ে বেড়িয়েছি পাছে নিজের জাত ভুলি। ওরি বাণীলোকে ছিল আমার আদি বসতি। পাতা খুললেই পেন্সিলে চিহ্নিত তার রাস্তা গলির নির্দ্দেশ পাবে। আর আজ! এই দেখো চেয়ে!"

এলা হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে অতীনের পা জড়িয়ে ধরলে। বললে,"মাপ করো, অন্তু, আমাকে মাপ করো।"

"তোমাকে মাপ করবার কী আছে এলী? ভগবান যদি থাকেন, তাঁর যদি থাকে অসীম দয়া তবে তিনি যেন আমাকে মাপ করেন।"

"যখন তোমাকে চিনতুম না তখন তোমাকে এই রাস্তায় দাঁড় করিয়েছি।"

অতীন হেসে উঠে বল্‌লে, "নিজেরই পাগলামির ফুল্‌ স্টীমে এই অস্থানে পৌঁচেছি সে খ্যাতিটুকুও দেবে না আমাকে? আমাকে নাবালকের কোঠায় ফেলে অভিভাবকগিরি করতে এলে আমি সইব না ব'লে রাখছি। তার চেয়ে মঞ্চ থেকে নেমে এসো; আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলো—এসো এসো বঁধু এসো আধো আঁচরে বোসো।"

"হয়তো বলতুম কিন্তু আজ তুমি এমন করে ক্ষেপে উঠলে কেন?"

"ক্ষেপব না? বল্‌লে কিনা ভুজ-মৃণালের জোরে তুমি আমাকে পথে বের করেছ!"

"সত্যি কথা বললে রাগ করো কেন?"

"সত্যি কথা হোলো? আমি ছিট্‌কে পড়েছি রাস্তায় অন্তরের বেগে, তুমি উপলক্ষ্য মাত্র। অন্য কোনো শ্রেণীর বঙ্গ মহিলাকে উপলক্ষ্য পেলে এতদিনে গোরা-কালা-সম্মিলনী ক্লাবে ব্রিজ খেল্‌তে যেতুম, ঘোড় দৌড়ের মাঠে গবর্ণরের বক্সের অভিমুখে স্বর্গারোহণ পর্ব্বের সাধনা করতুম। যদি প্রমাণ হয় আমি মূঢ় তবে জাঁক করে বলব সে মূঢ়তা স্বয়ং আমারি, যাকে বলে ভগবদ্দত্ত প্রতিভা।"

"অন্তু, দোহাই তোমার, আর বাজে বকুনি বোকো না! তোমার জীবিকা আমিই ভাসিয়ে দিয়েছি এ দুঃখ কখনো ভুলতে পারব না। দেখতে পাচ্চি তোমার জীবনের মূল গেছে ছিন্ন হয়ে।"

"এতক্ষণে সেই মেয়ের প্রকাশ হোলো, যে-মেয়েটি রিয়ল্। একটুতেই ধরা পড়ে দেশোদ্ধারের রঙ্গমঞ্চে তুমি রোম্যান্টিক। যে-সংসারে কাঁসার থালায় দুধ ভাত মাছের মুড়ো তারি কেন্দ্রে বসে আছ তালপাতার পাখা হাতে। যেখানে পোলিটিক্যাল ঠ্যাঙার গুঁতি সেখানে আলু-থালু চুলে চোখ দুটো পাকিয়ে এসে পড়ো অপ্রকৃতিস্থতার ঝোঁকে, সহজবুদ্ধি নিয়ে নয়।"

"এত কথাও বলতে পারো, অন্তু, মেয়েমানুষও তোমার কাছে হার মানে।"

"মেয়েমানুষ কথা বলতে পারে না কি! তারা তো শুধু বকে। কথার টর্পেডো দিয়ে সনাতন মূঢ়তার ভিৎ ভাঙব ব'লে একদিন মনের মধ্যে ঝোড়ো মেঘ জমে উঠেছিল। সেই মূঢ়তার উপরেই তোমাদের জয়স্তম্ভ গাঁথতে বেরিয়েছ কেবল গায়ের জোরে।"

"তোমার পায়ে পড়ি আমাকে বুঝিয়ে দাও আমার

ভুলে তুমি ভুল কেন করলে? কেন নিলে জীবিকা-বর্জ্জনের দুঃখ?”

“ওটা আমার ব্যঞ্জনা, ইংরেজিতে যাকে বলে জেস্‌চার। ওটা আমার নিদেন কালের ভাষা। যদি দুঃখ না মানতুম তা হোলে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে, কিছুতে বুঝতে না তোমাকে কতখানি ভালোবেসেছি। সেই কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বোলো না ওটা দেশকে ভালোবাসা।”

“দেশ এর মধ্যে নেই অন্তু?”

“দেশের সাধনা আর তোমার সাধনা এক হয়েছে ব’লেই দেশ এর মধ্যে আছে। একদিন বীর্য্যের জোরে যোগ্যতা দেখিয়ে পেতে হোতো মেয়েকে। আজ সেই মরণপণের সুযোগ পেয়েছি। সে কথাটা ভুলে সামান্য আমার জীবিকার অভাব নিয়ে তোমার ব্যথা লেগেছে অন্নপূর্ণা!”

“আমরা মেয়েরা সাংসারিক। সংসারে অকুলোন সইতে পারিনে। আমার একটা কথা তোমাকে রাখতেই হবে। আমার আছে পৈতৃক বাড়ি, আরো আছে কিছু জমা টাকা। দোহাই তোমার, বার বার দোহাই দিচ্চি, কথা রাখো, আমার কাছে টাকা নিতে সঙ্কোচ কোরো না। জানি তোমার খুবই দরকার।”

"খুবই দরকার পড়লে ম্যাট্রিকুলেশনের নোট বই লেখা থেকে আরম্ভ ক'রে কুলিগিরি পর্য্যন্ত খোলা রয়েছে।"

"আমি মান্‌ছি, অন্তু, আমার সমস্ত জমা টাকা দেশের কাজে এতদিনে খরচ করে ফেলা উচিত ছিল। কিন্তু উপার্জ্জনে আমাদের সুযোগ কম বলেই সঞ্চয়ে আমাদের অন্ধ আসক্তি। ভীতু আমরা।"

"ওটা তোমাদের সহজ বুদ্ধির উপদেশ। নিঃসম্বলতায় মেয়েদের শ্রী নষ্ট হয়।"

"আমাদের ছোটো নীড়, সেখানে টুকিটাকি কিছু আমরা জমা করি। কিন্তু সে তো কেবল বাঁচবার প্রয়োজনে নয়, ভালোবাসবার প্রয়োজনে। আমার যা কিছু সমস্তই তোমার জন্যে, এ কথা যদি বুঝিয়ে দিতে পারি তাহোলে বাঁচি।"

"কিছুতেই বুঝব না ওকথাটা। আজ পর্য্যন্ত মেয়েরা জুগিয়েছে সেবা, পুরুষরা জুগিয়েছে জীবিকা। তার বিপরীত ঘট্‌লে মাথা হেঁট হয়। যে-চাওয়া নিয়ে অসঙ্কোচে তোমার কাছে হাত পাততে পারি তাকে ঠেকিয়ে দিয়ে তুমি পণের বাঁধ বেঁধেছ। সেদিন নারায়ণী ইস্কুলের খাতা নিয়ে হিসেব মেলাচ্ছিলে। বসে

পড়লুম কাছে, ঝড়ের ঘা খেয়ে চিল যেমন ধূলায় পড়ে তেমনি। মার-খাওয়া মন নিয়ে এসেছিলুম। কর্ত্তব্যের যেমন-তেমন একটা ছাপমারা জিনিষে মেয়েদের নিষ্ঠা পাণ্ডার পায়ে তাদের অটল ভক্তির মতোই, ছাড়িয়ে নেওয়া অসম্ভব। মুখ তুলে চাইলে না। বসে বসে এক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে ইচ্ছা করছিলুম ওই সুকুমার আঙুলগুলির ডগা দিয়ে স্পর্শসুধা পড়ুক ঝরে আমার দেহে মনে। দরদ লাগল না তোমার কোনো খানেই; কৃপণ, সেটুকুও দিতে পারলে না! মনে মনে বললুম, আরো বেশি দাম দিতে হবে বুঝি। একদিন ফাটা মাথা কাটা দেহ নিয়ে পড়্‌ব মাটিতে, তখন ভেঙে-পড়া প্রাণটাকে নেবে তোমার কোলে তুলে।"

এলার চোখ ছলছলিয়ে এলো, বল্‌লে, "আঃ, তোমার সঙ্গে পারিনে, অন্তু! এটুকু না চেয়ে নিতে পারলে না? কেড়ে নিলে না কেন আমার খাতা? বুঝতে পারো না, তোমারি সঙ্কোচ আমাকে সঙ্কুচিত করে। অন্তু, তোমার স্বভাব এক জায়গায় মেয়েদের মতো। ইচ্ছে থাকতে পারে প্রবল কিন্তু উদ্দামভাবে তার দাবী প্রকাশ করতে তোমার রুচিতে ঠেকে।"

"বংশগত ধারণা, ছেলেবেলা থেকে রক্তে মাংসে

জড়ানো। বরাবর ভেবে এসেছি মেয়েদের দেহে মনে একটা শুচিতার মর্য্যাদা আছে; তাদের দেহের সম্মানকে সশঙ্কচিত্তে রক্ষা করা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগত অভ্যাস। আমার কুণ্ঠিত মনকে একটুমাত্র প্রশ্রয় দেবার জন্যে তোমার মন যদি কখনো আর্দ্র হয় তবে আমার পক্ষ থেকে ভিক্ষে চাইবার অপেক্ষা কোরো না। আমি শিখিনি তেমন করে চাইতে। ক্ষুধার সীমা নেই, তাই ব'লে পেটুক হোতে পারব না, ওটা আমার ধাতে নেই। আমার কামনার কৌলীন্য নষ্ট করতে পারিনে।"

এলা অতীনের কাছে এসে ঘেঁসে বসল, তার মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার উপরে নিজের মাথা হেলিয়ে রাখলে। কখনো কখনো আস্তে আস্তে চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে অতীন মাথা তুলে ব'সে এলার হাত চেপে ধরলে। বললে, "যেদিন মোকামায় খেয়াজাহাজে চড়েছিলুম সেদিন ভাগ্যদেবী পিতামহী অদৃশ্য হাতে কান ম'লে দিয়ে গেলেন তা বুঝতে পারিনি। তার অনতিকাল পর থেকেই মনটা কেবল আকাশ-কুসুম চয়ন করে বেড়াচ্চে স্মৃতির আকাশে। সেদিনের কথা তোমার কাছে পুরোনো হয়েছে কি?"

"একটুও না।"

"তাহোলে শোনো। ভারী মাল নীচের ডেক্ থেকে গাড়িতে নিয়ে গেছে আমার বিহারী চাকরটা। কাছে ছিল ছোটো একটা চামড়ার কেস্—এদিক ওদিকে তাকাচ্চি কুলির অপেক্ষায়। নেহাৎ ভালো মানুষের মতো হঠাৎ কাছে এসে বল্‌লে, কুলি চান? দরকার কী! আমি নিচ্চি।—হাঁ হাঁ করেন কী, করেন কী বলতে বলতেই সেটা তুলে ফেললে। আমার বিপত্তি দেখে যেন পুনশ্চ নিবেদনে বললে, সঙ্কোচ বোধ করেন তো এক কাজ করুন, আমার বাক্সোটা ঐ আছে তুলে নিন্, পরস্পর ঋণ শোধ হয়ে যাবে।—তুলতে হোলো। আমার কেসের চেয়ে সাতগুণ ভারী। হাতলটা ধরে ডান হাতে বাঁ হাতে বদল করতে করতে টলতে টলতে রেলগাড়ির থর্ডক্লাস কামরায় টেনে তুললেম। তখন সিল্কের জামা ঘামে ভিজে, নিশ্বাস দ্রুত, নিস্তব্ধ অট্টহাস্য তোমার মুখে। হয়তো বা করুণা কোনো একটা জায়গায় লুকোনো ছিল, সেটা প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য মনে করেছিলে। সেদিন আমাকে মানুষ করার মহৎদায়িত্ব ছিল তোমারি হাতে।"

"ছী ছী, বোলোনা, বোলোনা, মনে করতে লজ্জা

বোধ হয়। কী ছিলুম তখন, কী বোকা, কী অদ্ভুত! তখন তুমি হাসি চেপে রাখতে ব'লেই আমার স্পর্দ্ধা বেড়ে গিয়েছিল। সহ্য করেছিলে কী করে? মেয়েদের কি বুদ্ধি থাকবার কোনো দরকার নেই?"

"থাক্ বা না থাক্ তাতে তো কিছু আসে যায়নি। সেদিন যে-পরিবেশের মধ্যে আমার কাছে দেখা দিয়েছিলে সে তো হায়ার ম্যাথম্যাটিক্স্ নয়, লজিক নয়। সেটা যাকে বলে মোহ। শঙ্করাচার্য্যের মতো মহামল্লও যার উপর মুদ্গরপাত ক'রে একটু টোল খাওয়াতে পারেননি। তখন বেলা পড়ে এসেছে, আকাশে, যা'কে বলে কনে-দেখা মেঘ। গঙ্গার জল লাল আভায় টলটল করছে। ঐ ছিপছিপে ক্ষিপ্রগমন শরীরটি সেই রাঙা আলোর ভূমিকায় চিরদিন আঁকা রয়ে গেল আমার মনে। কী হোলো তার পরে? তোমার ডাক শুনলুম কানে। কিন্তু এসে পড়েছি কোথায়? তোমার থেকে কতদূরে! তুমিও কি জানো তার সব বিবরণ?"

"আমাকে জানতে দাও না কেন অন্তু?"

"বারণ মানতে হয়। শুধু তাই কি? কী হবে সব কথা ব'লে?—আলো কমে গিয়েছে, এসো

আরো কাছে এসো। আমার চোখ দুটো এসেছে ছুটির দরবারে তোমার কাছে। একমাত্র তোমার কাছেই আমার ছুটি। অতি ছোটো তার আয়তন, সোনার জলে রাঙানো ফ্রেমের মতো। তারি মধ্যে ছবিটিকে বাঁধিয়ে নিইনে কেন? ঐ যে তোমার দুইএকগুচ্ছি অশিষ্ট চুল আলগা হয়ে চোখের উপর এসে পড়েছে, দ্রুত হাতে তুলে তুলে দিচ্চ; কালো পাড়-দেওয়া তসরের সাড়ি, ব্রোচ্ নেই কাঁধে, আঁচলটা মাথার চুলে বিঁধিয়ে রাখা, চোখে ক্লান্ত ক্লেশের ছায়া, ঠোঁটে মিনতির আভাস, চারিদিকে দিনের আলো ডুবে এসেছে শেষ অস্পষ্টতায়। এই যা দেখছি এইটিই আশ্চর্য্য সত্য, এর মানে কী, কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারব না, কোনো এক অদ্বিতীয় কবির হাতেই ধরা দিতে পারল না ব'লে এর অব্যক্ত মাধুর্য্যের মধ্যে এত গভীর বিষাদ। এই ছোটো একটি অপরূপ পরিপূর্ণতাকে চারদিকে ভ্রূকুটি ক'রে ঘিরে আছে বড়ো নামওয়ালা বড়ো ছায়াওয়ালা বিকৃতি।"

"কী বল্‌ছ, অন্তু!"

"অনেকখানি মিথ্যে। মনে পড়ছে কুলি-বস্‌তিতে

আমাকে বাসা নিতে বলেছিলে। তোমার মনের মধ্যে ছিল আমার বংশের অভিমানকে ধূলিসাৎ করবার অভিপ্রায়। তোমার সেই সুমহৎ অধ্যবসায়ে আমার মজা লাগল। ডিমক্রাটিক পিক্‌নিকে নাবা গেল। গাড়োয়ান-পাড়াতে ঘুরলুম। দাদা খুড়োর সম্পর্ক পাতিয়ে চললুম বহুবিধ মোষের গোয়ালঘরের পাশে পাশে। কিন্তু তাদেরও বুঝতে বাকি ছিল না, আমারও নয় যে এই সম্পর্কের ছাপগুলো ধোপ সইবে না। নিশ্চয় এমন মহৎ লোক আছেন সব যন্ত্রেই যাঁদের সুর বাজে, এমন কি, তুলো-ধোনা যন্ত্রেও। আমরা নকল করতে গেলে সুর মেলে না। দেখোনি তোমাদের পাড়ার খৃষ্টশিষ্যকে, ব্রাদার ব'লে যাকে তাকে বুকে চেপে ধরা তার অনুষ্ঠানের অঙ্গ। এতে খৃষ্টকে ব্যঙ্গ করা হয়।"

"কী হয়েছে তোমার অন্তু! কোন ক্ষোভের মুখে এসব কথা বল্‌ছ? তুমি কি বল্‌তে চাও কর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য ব'লে মানা যায় না অরুচি কাটিয়ে দিয়েও?"

"রুচির কথা হচ্চে না এলী, স্বভাবের কথা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বীরের কর্ত্তব্যই করতে বলেছিলেন অত্যন্ত অরুচি সত্ত্বেও; কুরুক্ষেত্র চাষ করবার উদ্দেশে এগ্রিকাল্‌চারাল ইকনমিক্‌স্ চর্চ্চা করতে বলেননি।"

"শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে হোলে কী বলতেন, অন্তু?"

"অনেকদিন আগেই কানে কানে ব'লে রেখেছেন। সেই তাঁর কানে-কানে কথাটাকে মুখ খুলে বলবার ভার ছিল আমার 'পরে। নির্ব্বিচারে সবারই একই কর্ত্তব্য, গুরুমশায় কানে ধ'রে এই কথাটা বলতেই এত কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়েছে। তোমাকে মুখের উপরই বলছি ওদের যে-পাড়ায় অহঙ্কার ক'রে নম্রতা করতে যাও সেখানে তোমারো জায়গা নেই। দেবী! সবাই দেবী তোমরা! নকল দেবীর কৃত্রিম সাজ, মেয়েদের অন্য সাজেরই মতো, পুরুষ দর্জ্জির দোকানে বানানো।"

"দেখো অন্তু, আজো বুঝতে পারিনে যে-পথ তোমার নয়, সে পথ থেকে কেন তুমি জোর করে ফিরে আসোনি?"

"তাহোলে বলি। অনেক কথা জানতুম না অনেক কথা ভাবিনি এই পথে প্রবেশ করবার আগে। একে একে এমন সব ছেলেকে কাছে দেখলুম, বয়সে যারা ছোটো না হোলে যাদের পায়ের ধূলো নিতুম। তারা চোখের সামনে কী দেখেছে, কী সয়েছে, কী অপমান হয়েছে তাদের, সে সব দুর্ব্বিষহ কথা কোথাও প্রকাশ হবে না। এরি অসহ্য ব্যথায় আমাকে ক্ষেপিয়ে

তুলেছিল। বারবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, ভয়ে হার মান্‌ব না, পীড়নে হার মান্‌ব না, পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকে মরব তবু তুড়ি মেরে উপেক্ষা করব সেই হৃদয়হীন দেয়ালটাকে।”

“তারপরে কি তোমার মত বদলে গেল?”

“শোনো আমার কথা। শক্তিমানের বিরুদ্ধে যে লড়াই করবে, সে উপায়বিহীন হোলেও সে-ই শক্তিমানের সমকক্ষে দাঁড়ায়; তাতে তার সম্মান রক্ষা হয়। সেই সম্মানের অধিকার আমি কল্পনা করেছিলুম। দিন যতই এগোতে থাক্‌ল চোখের সামনে দেখা গেল,—অসাধারণ উচ্চ মনের ছেলে অল্পে অল্পে মনুষ্যত্ব খোয়াতে থাকল। এত বড়ো লোকসান আর কিছুই নেই। নিশ্চিত জানতুম আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবে, রেগে বিদ্রূপ করবে, তবু ওদের বলেছি অন্যায়ে অন্যায়কারীর সমান হোলেও তাতে হার, পরাজয়ের আগে মরবার আগে প্রমাণ করে যেতে হবে আমরা ওদের চেয়ে মানবধর্ম্মে বড়ো—নইলে এত বড়ো বলিষ্ঠের সঙ্গে এমনতরো হারের খেলা খেলছি কেন? নির্ব্বুদ্ধিতার আত্মঘাতের জন্যে?—আমার কথা ওদের কেউ বোঝেনি তা নয়। কিন্তু কত জনই বা!”

"তখনো ওদের ছাড়লে না কেন?"

"আর কি ছাড়তে পারি? তখন যে শাস্তির নিষ্ঠুর জাল সম্পূর্ণ জড়িয়ে এসেছে ওদের চারদিকে। ওদের ইতিহাস নিজে দেখলুম, বুঝতে পেরেছি ওদের মর্ম্মান্তিক বেদনা, সেইজন্যেই রাগই করি আর ঘৃণাই করি, তবু বিপন্নদের ত্যাগ করতে পারিনে। কিন্তু একটা কথা এই অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ বুঝেছি, গায়ের জোরে আমরা যাদের অত্যন্ত অসমকক্ষ তাদের সঙ্গে গায়ের জোরের মল্লযুদ্ধ করতে চেষ্টা করলে আন্তরিক দুর্গতি শোচনীয় হয়ে ওঠে। রোগ সব শরীরেই দুঃখের কিন্তু ক্ষীণ শরীরে মারাত্মক। মনুষ্যত্বের অপমান করেও কিছুদিনের মতো জয়ডঙ্কা বাজিয়ে চলতে পারে তারা যাদের আছে বাহুবল, কিন্তু আমরা পারব না। আগাগোড়া কলঙ্কে কালো হয়ে পরাভবের শেষসীমায় অখ্যাতির অন্ধকারে মিশিয়ে যাব আমরা।"

"কিছুকাল থেকে এই ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডির চেহারা আমার কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অন্তু। গৌরবের আহ্বানে নেমেছিলেম কিন্তু লজ্জা বেড়ে উঠছে প্রতিদিন। এখন আমরা কী করতে পারি বলো আমাকে।"

"সব মানুষের সামনেই ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মযুদ্ধ আছে, সেখানে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং। কিন্তু অন্তত আমাদের ক-জনের জন্যে এ যাত্রায় সে ক্ষেত্রের পথ বন্ধ। এখানকার কর্ম্মফল এখানেই নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়ে যেতে হবে।"

"সব বুঝতে পারছি, তবু অন্তু আমাদের দেশের কাজ নিয়ে কিছুদিন থেকে এমন কঠিন ধিক্কার দিয়ে তুমি কথা বলো, সে আমাকে বড়ো বাজে!"

"তার কারণ কী সে কথা এখন আর না বল্‌লেও হয়, সময় চলে গেছে।"

"তবু বলো।"

"আমি আজ স্বীকার করব তোমার কাছে,—তোমরা যাকে পেট্রিয়ট বলো আমি সেই পেট্রিয়ট নই। পেট্রিয়টিজমের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্ব্বোচ্চে না মানে তাদের পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ কুমীরের পিঠে চ'ড়ে পার হবার খেয়া নৌকো। মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই গর্ত্তের ভিতরকার কুশ্রী জগৎটার মধ্যে দিনরাত মিথ্যের বিষাক্ত হাওয়ায়

কখনোই নিজের স্বভাবে সেই পৌরুষকে রক্ষা করতে পারব না যাতে পৃথিবীতে কোনো বড়ো কাজ করতে পারা যায়।”

“আচ্ছা অন্তু, তুমি যাকে আত্মঘাত বলো সে কি কেবল আমাদেরি দেশে?”

“তা বলিনে। দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ঙ্কর মিথ্যে কথা পৃথিবীসুদ্ধ ন্যাশনালিষ্ট আজকাল পাশবগর্জ্জনে ঘোষণা করতে বসেছে, তার প্রতিবাদ আমার বুকের মধ্যে অসহ্য আবেগে গুম্‌রে গুম্‌রে উঠছে—এই কথা সত্যভাষায় হয়তো বলতে পারতুম, সুরঙ্গের মধ্যে লুকোচুরি ক'রে দেশ উদ্ধার চেষ্টার চেয়ে সেটা হোতো চিরকালের বড়ো কথা। কিন্তু এ জন্মের মতো বলবার সময় হোলো না। আমার বেদনা তাই আজ এত নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে।”

এলা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে, বললে,—“ফিরে এসো অন্তু।”

“আর ফেরবার পথ নেই।”

“কেন নেই?”

“অজায়গায় যদি এসে পড়ি সেখানকারও দায়িত্ব আছে শেষ পর্য্যন্ত।”

এলা অতীনের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "ফিরে এসো, অন্তু। এত বছর ধরে যে বিশ্বাসের মধ্যে বাসা নিয়েছিলুম তার ভিৎ তুমি ভেঙে দিয়েছ। আজ আছি ভেসে-চলা ভাঙা নৌকো আঁকড়িয়ে। আমাকেও উদ্ধার করে নিয়ে যাও।—অমন চুপ করে বসে থেকো না, বলো অন্তু, একটা কথা বলো। এখনি তুমি হুকুম করো আমি ভাঙব পণ। ভুল করেছি আমি। আমাকে মাপ করো।"

"উপায় নেই।"

"কেন উপায় নেই? নিশ্চয় আছে।"

"তীর লক্ষ্য হারাতে পারে তূণে ফিরতে পারে না।"

"আমি স্বয়ম্বরা, আমাকে বিয়ে করো অন্তু। আর সময় নষ্ট করতে পারব না—গান্ধর্ব্ব বিবাহ হোক্, সহধর্ম্মিণী করে নিয়ে যাও তোমার পথে।"

বিপদের পথ হোলে নিয়ে যেতুম সঙ্গে। কিন্তু যেখানে ধর্ম্ম নষ্ট হয়েছে সেখানে তোমাকে সহধর্ম্মিণী করতে পারব না।—থাক্ থাক্ ও সব কথা থাক্। এ জীবনের নৌকোডুবির অবসানে কিছু সত্য এখনো বাকি আছে। তারি কথাটা শুনি তোমার মুখে।"

"কী বল্‌ব?"

"বলো, তুমি ভালোবেসেছ।"

"হাঁ বেসেছি।"

"বলো, আমি তোমাকে ভালোবেসেছি সেকথা তোমার মনে থাকবে আমি যখন থাকব না তখনো।"

এলা নিরুত্তরে চুপ করে বসে রইল, জল পড়তে লাগল দুই চোখে। অনেকক্ষণ পরে বাষ্পরুদ্ধ গলায় বললে, "আবার বলছি, অন্তু, কিছু নাও আমার হাত থেকে—নাও এই আমার গলার হার।"

এই ব'লে পায়ের উপর রাখল হার।

"কিছুতেই না।"

"কেন, অভিমান ?"

"হাঁ, অভিমান। এমন দিন ছিল তখন যদি দিতে, পরতুম গলায়—আজ দিলে পকেটে, অন্নাভাবের গর্ত্ত-টার মধ্যে। ভিক্ষে নেব না তোমার কাছে।"

এলা অতীনের পায়ের কাছে লুটিয়ে বললে, "নাও আমাকে তোমার সঙ্গিনী ক'রে।"

"লোভ দেখিয়ো না, এলা। অনেকবার বলেছি আমার পথ তোমার নয়।"

"তবে সে পথ তোমারো নয়। ফিরে এসো, ফিরে এসো।"

"পথ আমার নয়, আমিই পথের। গলার ফাঁসকে গলার গয়না কেউ বলে না।"

"অন্ত, নিশ্চয় জেনো, তুমি চলে গেলে এক মুহূর্ত্ত আমি বাঁচব না। তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার, এ কথায় আজ যদিবা সন্দেহ করো, একান্ত মনে আশা করি মৃত্যুর পরে সে সন্দেহ সম্পূর্ণ ঘোচাবার একটা কোনো রাস্তা কোথাও আছে।"

হঠাৎ অতীন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তীরের মতো তীক্ষ্ণ হুইস্‌লের শব্দ এলো দূর থেকে। চম্‌কে ব'লে উঠ্‌ল, "চললুম।"

এলা তাকে জড়িয়ে ধরলে, বল্‌লে, "আর একটু থাকো।"

"না।"

"কোথায় যাচ্চ?"

"কিচ্ছু জানিনে।"

এলা অতীনের পা জড়িয়ে ধরে বল্‌লে "আমি তোমার সেবিকা, তোমার চরণের সেবিকা, আমাকে ফেলে যেয়োনা, ফেলে যেয়োনা।"

একটুক্ষণ থম্‌কে দাঁড়িয়ে রইল অতীন। দ্বিতীয়বার হুইস্‌লের শব্দ এলো। অতীন গর্জ্জন করে বললে,

"ছেড়ে দাও।"—ব'লে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। এলা মেঝের উপর উপুড় হয়ে প'ড়ে। তার বুকের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে, তার চোখে জল নেই। এমন সময় গম্ভীর গলার ডাক শুনতে পেল, "এলা!"

চম্‌কে উঠে বস্‌ল। দেখলে ইলেক্‌ট্রিক্ টর্চ হাতে ইন্দ্রনাথ। তখনি উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "ফিরিয়ে আনুন অন্তুকে।"

"সে কথা থাক্। এখানে কেন এলে?"

"বিপদ আছে জেনেই এসেছি।"

তীব্র ভর্ৎসনার সুরে ইন্দ্রনাথ বললেন, 'তোমার বিপদের কথা কে ভাবছে? এখানকার খবর তোমাকে কে দিলে?"

"বটু।"

"তবু বুঝ্‌লে না মৎলব?"

"বোঝবার বুদ্ধি আমার ছিল না। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল।"

"তোমাকে মারতে পারলে এখনি মারতুম। যাও ঘরে ফিরে। ট্যাক্‌সি আছে বাইরে।"

চতুর্থ অধ্যায়

“আবার অখিল !—পালিয়েছিস্ বোর্ডিং থেকে ! তোর সঙ্গে কোনোমতে পারবার জো নেই। বারবার বলছি, এ বাড়িতে খবরদার আসিস্‌নে। মরবি যে !”

অখিল কোনো উত্তর না দিয়ে গলার স্বর নামিয়ে বললে, “একজন দাড়িওয়ালা কে পিছনের পাঁচিল টপকিয়ে বাগানে ঢুকল। তাই তোমার এ ঘরে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলুম।—ঐ শোনো পায়ের শব্দ।” অখিল তার ছুরির সব চেয়ে মোটা ফলাটা খুলে দাঁড়াল।

এলা বললে, “ছুরি খুলতে হবে না তোমাকে, বীরপুরুষ। দে বলছি।” ওর হাত থেকে ছুরি কেড়ে নিলে।

সিঁড়ি থেকে আওয়াজ এলো, “ভয় নেই, আমি অন্তু।”

মুহূর্ত্তে এলার মুখ পাংশু বর্ণ হয়ে এলো—বললে, “দে দরজা খুলে।”

দরজা খুলে দিয়ে অখিল জিজ্ঞাসা করলে, "সেই দাড়িওয়ালা কোথায় ?"

"দাড়ি নিশ্চয় পাওয়া যাবে বাগানে, বাকি মানুষটাকে পাবে এইখানেই। যাও খোঁজ করো গে দাড়ির।" অখিল চলে গেল।

এলা পাথরের মূর্ত্তির মতো ক্ষণকাল একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বললে, "অন্তু, এ কী চেহারা তোমার ?"

অতীন বললে, "মনোহর নয়।"

"তবে কি সত্যি ?"

"কী সত্যি ?"

"তোমাকে সর্ব্বনেশে ব্যামোয় ধরেছে।"

"নানা ডাক্তারের নানা মত, বিশ্বাস না করলেও চলে।"

"নিশ্চয় তোমার খাওয়া হয়নি।"

"ও কথাটা থাক্। সময় নষ্ট কোরো না।"

"কেন এলে, অন্তু, কেন এলে ? এরা যে তোমাকে ধরবার অপেক্ষায় আছে।"

"ওদের নিরাশ করতে চাইনে।"

অতীনের হাত চেপে ধরে এলা বললে, "কেন এলে এই নিশ্চিত বিপদের মধ্যে ? এখন উপায় কী ?"

"কেন এলুম সেই কথাটা যাবার ঠিক আগেই ব'লে চলে যাব। ইতিমধ্যে যতক্ষণ পারি ঐ কথাটাই ভুলে থাকতে চাই। নীচের দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে আসি গে।"

খানিক পরে উপরে এসে বললে, "চলো ছাদে। নীচের তলাকার আলোর বাল্‌ব্‌গুলো সব খুলে নিয়েছি। ভয় পেয়ো না।"

তুজনে ছাদে এসে ছাদে প্রবেশের দরজা বন্ধ করে দিলে। বন্ধ দরজায় ঠেসান দিয়ে বসল অতীন, এলা বসল তার সাম্‌নে।

"এলা, মন সহজ করো। যেন কিছু হয়নি, যেন আমরা তুজনে আছি লঙ্কাকাণ্ড আরম্ভ হবার আগে সুন্দরকাণ্ডে। তোমার হাত অমন বরফের মতো ঠাণ্ডা কেন? কাঁপছে যে। দাও, গরম করে দিই।"

এলার হাত তুখানি নিয়ে অতীন জামার নীচে বুকের উপর চেপে রাখলে। তখন দূরের পাড়ায় বিয়েবাড়িতে সানাই বাজছে।

"ভয় করছে, এলী?"

"কিসের ভয়?"

"সমস্ত কিছুর। প্রত্যেক মুহূর্তের।"

"ভয় তোমার জন্যে, অন্ত, আর কিছুর জন্যে নয়।"

অতীন বল্‌লে, "এলী, মনে করতে চেষ্টা করো আমরা আছি পঞ্চাশ কি একশো বছর পরেকার এমনি এক নিস্তব্ধ রাতে। উপস্থিতের গণ্ডীটা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, তার মধ্যে ভয় ভাবনা দুঃখ কষ্ট সমস্তই প্রকাণ্ডতার ভান ক'রে দেখা দেয়। বর্ত্তমান সেই নীচ পদার্থ যার ছোটো মুখে বড়ো কথা। ভয় দেখায় সে মুখোষ প'রে—যেন আমরা মুহূর্ত্তের কোলে নাচানো শিশু। মৃত্যু মুখোষখানা টান মেরে ফেলে দেয়। মৃত্যু অত্যুক্তি করে না। যা অত্যন্ত করে চেয়েছি তার গায়ে মোটা অঙ্কের দাম লেখা ছিল বর্ত্তমানের ফাঁকির কলমে, যা অত্যন্ত ক'রে হারিয়েছি তার গায়ে দুদিনের কালী লেবেল মেরে লিখেছে অপরিসীম দুঃখ। মিথ্যে কথা! জীবনটা জালিয়াৎ, সে অনন্তকালের হস্তাক্ষর জাল ক'রে চালাতে চায়। মৃত্যু এসে হাসে, বঞ্চনার দলিলটা লোপ করে দেয়। সে হাসি নিষ্ঠুর হাসি নয়, বিদ্রূপের হাসি নয়, শিবের হাসির মতো সে শান্ত সুন্দর হাসি, মোহরাত্রির অবসানে। এলী, রাত্রে একলা বসে কখনো মৃত্যুর স্নিগ্ধ সুগভীর মুক্তি অনুভব করেছ, যার মধ্যে চির-কালের ক্ষমা?"

"তোমার মতো বড়ো করে দেখবার শক্তি আমার নেই অন্তু,—তবু তোমাদের কথা মনে ক'রে উদ্বেগে যখন অভিভূত হয়ে পড়ে মন,—তখন এই কথাটা খুব নিশ্চিত করে অনুভব করতে চেষ্টা করি যে মরা সহজ।"

"ভীরু, মৃত্যুকে পালাবার পথ ব'লে মনে করছ কেন? মৃত্যু সব চেয়ে নিশ্চিত—জীবনের সব গতি-স্রোতের চরম সমুদ্র, সব সত্য মিথ্যা ভালো মন্দর নিঃশেষ সমন্বয় তার মধ্যে। এইরাত্রে এখনি আমরা আছি সেই বিরাটের প্রসারিত বাহুর বেষ্টনে আমরা দুজনে—মনে পড়ছে ইব্‌সেনের চারিটি লাইনঃ—

Upwards
Towards the peaks,
Towards the stars,
Towards the vast silence.

এলা অতীনের হাত কোলে নিয়ে বসে রইল স্তব্ধ হয়ে। হঠাৎ অতীন হেসে উঠল। বল্‌লে—"পিছনে মরণের কালোপর্দ্দাখানা নিশ্চল টানা রয়েছে অসীমে, তারি উপর জীবনের কৌতুক নাট্য নেচে চল্‌ছে অন্তিম অঙ্কের দিকে। তারি একটা ছবি আজ দেখো চেয়ে।

আজ তিন বছর আগে এই ছাদের উপর তুমি আমার জন্মদিনের উৎসব করেছিলে, মনে আছে ?”

“খুব মনে আছে।”

“তোমার ভক্ত ছেলের দল সবাই এসেছিল। ভোজের আয়োজন ঘটা করে হয়নি। চিঁড়ে ভেজেছিলে সঙ্গে ছিল কলাইসুটি সিদ্ধ, মরিচের গুঁড়ো ছিটানো; ডিমের বড়াও ছিল মনে পড়ছে। সবাই মিলে খেল কাড়াকাড়ি ক'রে। হঠাৎ মতিলাল হাত পা ছুঁড়ে সুরু করলে, আজ নবযুগে অতীন বাবুর নবজন্মের দিন—আমি লাফ দিয়ে উঠে তার মুখ চেপে ধরলুম, বললুম, বক্তৃতা যদি করো, তবে তোমার পুরোনো জন্মের দিনটা এইখানেই কাবার। বটু বল্লে, ছী ছী অতীনবাবু, বক্তৃতার ভ্রূণহত্যা ?—নব যুগ, নব জন্ম, মৃত্যুর তোরণ প্রভৃতি ওদের বাঁধা বুলিগুলো শুনলে আমার লজ্জা করে। ওরা প্রাণপণে চেষ্টা করেছে আমার মনের উপর ওদের দলের তুলি বুলোতে,—কিছুতে রং ধরল না।”

“অস্তু, নির্ব্বোধ আমি; আমিই ভেবেছিলুম তোমাকে মিলিয়ে নেব আমাদের সকল পদাতিকের সঙ্গে এক উর্দ্দি পরিয়ে।”

"তাই আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওদের সঙ্গে ঘোরতর দিদিয়ানা করতে। ভেবেছিলে আমার সংশোধনের পক্ষে কিছু ঈর্ষ্যার প্রয়োজন আছে। স্নেহ যত্ন কুশল সম্ভাষণ বিশেষ মন্ত্রণা অনাবশ্যক উদ্বেগ মণি-হারির রঙীন সামগ্রীর মতো ওদের সামনে সাজিয়ে রেখেছিলে তোমার পসরায়। আজো তোমার করুণ প্রশ্ন কানে শুনতে পাচ্চি, নন্দকুমার তোমার চোখমুখ লাল দেখছি কেন। বেচারা ভালোমানুষ, সত্যের অনুরোধে মাথাধরা অস্বীকার করতে না করতে ছেঁড়া ন্যাকড়ার জলপটি এসে উপস্থিত। আমি মুগ্ধ তবু বুঝতুম এই অতি অমায়িক দিদিয়ানা তোমার অতি পবিত্র ভারতবর্ষের বিশেষ ফরমাসের। একেবারে আদর্শ স্বদেশী দিদিবৃত্তি।"

"আঃ চুপ করো, চুপ করো অন্তু।"

"অনেক বাজে জিনিষের বাহুল্য ছিল সেদিন তোমার মধ্যে, অনেক হাস্যকর ভড়ং—সে কথা তোমাকে মানতেই হবে।"

"মান্‌ছি, মান্‌ছি, একশোবার মান্‌ছি। তুমিই সে সমস্ত নিঃশেষে ঘুচিয়ে দিয়েছ। তবে আজ আবার অমন নিষ্ঠুর করে বল্‌ছ কেন?"

"কোন মনস্তাপে বল্‌ছি, শোনো। জীবিকা থেকে ভ্রষ্ট করেছ ব'লে সেদিন আমার কাছে মাপ চাইছিলে। যথার্থ জীবনের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি অথচ সেই সর্ব্বনাশের পরিবর্ত্তে যা দাবী করতে পারতুম তা মেটে নি। আমি ভেঙেছি আমার স্বভাবকে, কুসংস্কারে অন্ধ তুমি ভাঙতে পারলে না তোমার পণকে যার মধ্যে সত্য ছিল না, এজন্যে মাপ চাওয়া কি বাহুল্য ছিল? জানি তুমি ভাবছ, এতটা কী ক'রে সম্ভব হোলো।"

"হাঁ অন্তু, আমার বিস্ময় কিছুতেই যায় না—জানিনে আমার এমন কী শক্তি ছিল!"

"তুমি কী করে জানবে? তোমাদের শক্তি তোমাদের নিজের নয়, ও মহামায়ার। কী আশ্চর্য্য সুর তোমার কণ্ঠে, আমার মনের অসীম আকাশে ধ্বনির নীহারিকা সৃষ্টি করে। আর তোমার এই হাত-খানি, ঐ আঙুলগুলি, সত্য মিথ্যে সব কিছুর 'পরে পরশমণি ছুঁইয়ে দিতে পারে। জানিনে, কী মোহের বেগে, ধিক্কার দিতে দিতেই নিয়েছি স্খলিত জীবনের অসম্মান। ইতিহাসে পড়েছি এমন বিপত্তির কথা, কিন্তু আমার মতো বুদ্ধি-অভিমানীর মধ্যে এটা যে ঘটতে পারে কখনো তা ভাবতে পারতুম না। এবার জাল

ছেঁড়বার সময় এলো, তাই আজ বলব তোমাকে সত্য কথা, যত কঠোর হোক্।"

"বলো, বলো, যা বলতে হয় বলো,। দয়া কোরো না আমাকে। আমি নির্ম্মম, নির্জ্জীব, আমি মূঢ়—তোমাকে বোঝবার শক্তি আমার কোনো কালে ছিল না। অতুল্য যা তাই এসেছিল হাত বাড়িয়ে আমার কাছে, অযোগ্য আমি, মূল্য দিইনি। বহুভাগ্যের ধন চিরজন্মের মতো চলে গেল। এর চেয়ে শাস্তি যদি থাকে, দাও শাস্তি।"

"থাক্, থাক্, শাস্তির কথা। ক্ষমাই করব আমি। মৃত্যু যে ক্ষমা করে সেই অসীম ক্ষমা। সেই জন্যেই আজ এসেছি।"

"সেই জন্যে?"

"হাঁ কেবলমাত্র সেইজন্যে।"

"নাই ক্ষমা জানাতে তুমি! কিন্তু কেন এলে এমন ক'রে বেড়া আগুনের মধ্যে? জানি, জানি, বাঁচবার ইচ্ছে নেই তোমার। তা যদি হয় তা হোলে ক-টা দিন কেবলমাত্র আমাকে দাও, দাও তোমার সেবা করবার শেষ অধিকার। পায়ে পড়ি তোমার।"

"কী হবে সেবা! ফুটো জীবনের ঘটে ঢাল্‌বে সুধা!

তুমি জানোনা, কী অসহ্য ক্ষোভ আমার! শুশ্রূষা দিয়ে তার কী করতে পারো, যে-মানুষ আপন সত্য হারিয়েছে!”

“সত্য হারাওনি অন্তু। সত্য তোমার অন্তরে আছে অক্ষুণ্ণ হয়ে।”

“হারিয়েছি, হারিয়েছি।”

“বোলো না বোলো না অমন কথা।”

“আমি যে কী যদি জানতে পারতে তোমার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত শিউরে উঠ্‌ত।”

“অন্তু, আত্মনিন্দা বাড়িয়ে তুল্‌ছ কল্পনায়। নিষ্কাম-ভাবে যা করেছ তার কলঙ্ক কখনোই লাগবে না তোমার স্বভাবে।”

“স্বভাবকেই হত্যা করেছি, সব হত্যার চেয়ে পাপ। কোনো অহিতকেই সমূলে মারতে পারিনি, সমূলে মেরেছি কেবল নিজেকে। সেই পাপে, আজ তোমাকে হাতে পেলেও তোমার সঙ্গে মিলতে পারব না। পাণি-গ্রহণ! এই হাত নিয়ে! কিন্তু কেন এ সব কথা! সমস্ত কালো দাগ মুছবে যমকন্যার কালো জলে, তারি কিনারায় এসে বসেছি। আজ বলা যাক যত সব হাল্‌কা কথা হাস্‌তে হাস্‌তে। সেই জন্মদিনের ইতি-বৃত্তটা শেষ করে দিই। কী বলো এলী?”

"অস্তু, মন দিতে পারছিনে।"

"আমাদের দুজনের জীবনে মন দেবার যোগ্য যা কিছু আছে সে কেবল ঐ রকম গোটাকয়েক হাল্‌কা দিনের মধ্যে। ভোলবার যোগ্য ভারি ভারি দিনই তো বহুবিস্তর।"

"আচ্ছা, বলো অস্তু।"

"জন্মদিনের খাওয়া হয়ে গেল। হঠাৎ নীরদের সখ হোলো পলাসীর যুদ্ধ আবৃত্তি করবে। উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে গিরীশ ঘোষের ভঙ্গীতে আউড়িয়ে গেল :—

—কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র কিরণ,

বারেক ফিরিয়া চাও ওগো দিনমণি।—

নীরদ লোক ভালো, অত্যন্ত সাদাসিধে, কিন্তু নির্দ্দয় তার স্মরণশক্তি। সভাটা ভেঙে ফেলবার জন্যে আমার মন যখন হন্যে হয়ে উঠেছে তখন ওরা ভবেশকে গান গাইতে অনুরোধ করলে। ভবেশ বল্‌লে, হার্ম্মোনিয়ম সঙ্গে না থাক্‌লে ও হাঁ করতে পারে না।— তোমার ঘরে ঐ পাপটা ছিল না। ফাঁড়া কাট্‌ল। আশান্বিত মনে ভাবছি এইবার উপসংহার, এমন সময় সতু খামকা তর্ক তুল্‌লে,—মানুষ জন্মায় জন্মদিনে না জন্মতিথিতে? যত বলি থামো সে থামে না। তর্কের

মধ্যে দেশাত্মবোধের ঝাঁজ লাগল, চড়তে লাগল গলার আওয়াজ, বন্ধুবিচ্ছেদ হয় আর কী। বিষম রাগ হোলো তোমার উপরে। আমার জন্মদিনকে একটা সামান্য উপলক্ষ্য করেছিলে, মহত্তর লক্ষ্য ছিল কর্ম্মভাইদের একত্র করা।”

“কোন্‌টা লক্ষ্য কোন্‌টা উপলক্ষ্য বাইরে থেকে বিচার কোরো না অন্তু। শাস্তির যোগ্য আমি, কিন্তু অন্যায় শাস্তির না। মনে নেই তোমার, সেইবারকার জন্মদিনেই অতীন্দ্রবাবু আমার মুখে নাম নিলেন অন্তু? সেটা তো খুব ছোটো কথা নয়। তোমার অন্তু নামের ইতিহাসটা বলো শুনি।”

“সখি, তবে শ্রবণ করো। তখন বয়স আমার চার পাঁচ বছর, মাথায় ছিলুম ছোটো, কথা ছিল না মুখে, শুনেছি বোকার মতো ছিল চোখের চাহনি। জ্যাঠামশায় পশ্চিম থেকে এসে আমাকে প্রথম দেখলেন। কোলে তুলে নিলেন, বললেন, এই বালখিল্যটার নাম অতীন্দ্র রেখেছে কে? অতিশয়োক্তি অলঙ্কার, এর নাম দাও অনতীন্দ্র। সেই অনতি শব্দটা স্নেহের কণ্ঠে অন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমার কাছেও একদিন অতি হয়েছে অনতি, ইচ্ছে ক'রে খুইয়েছে মান।”

হঠাৎ অতীন চম্‌কে উঠে থেমে গেল। বল্‌লে, "পায়ের শব্দ শুনছি যেন।"

এলা বল্‌লে, "অখিল।"

আওয়াজ এলো, "দিদিমণি।"

ছাদে আসবার দরজা খুলে দিয়ে এলা জিজ্ঞাসা করলে, "কী।"

অখিল বল্‌লে, "খাবার।"

বাড়িতে রান্নার ব্যবস্থা নেই। অদূরবর্ত্তী দিশী রেস্‌টোরাঁ থেকে বরাদ্দমতো খাবার দিয়ে যায়।

এলা বল্‌লে, "অন্তু, চলো খেতে।"

"খাওয়ার কথা বোলোনা। না খেয়ে মরতে মানুষের অনেকদিন লাগে। নইলে ভারতবর্ষ টি*কত না। ভাই অখিল, আর রাগ রেখোনা মনে। আমার ভাগটা তুমিই খেয়ে নাও। তারপরে পলায়নেন সমাপয়েৎ— দৌড় দিয়ো যত পারো।"

অখিল চলে গেল।

দুজনে তাদের মেঝের উপর বসল। অতীন আবার সুরু করলে। "সেদিনকার জন্মদিন চলতে লাগল একটানা, কেউ নড়বার নাম করে না। আমি ঘন ঘন ঘড়ি দেখছি, ওটা একটা ইঙ্গিত রাতকানাদের কাছে।

শেষকালে তোমাকে বললুম, সকাল সকাল তোমার শুতে যাওয়া উচিত, এই সেদিন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা থেকে উঠেছ।—প্রশ্ন উঠল, 'ক-টা বেজেছে?' উত্তর—সাড়ে দশটা। সভা ভাঙবার ছুটো একটা হাইতোলা গড়িমসি-করা লক্ষণ দেখা গেল। বটু বল্‌লে, বসে রইলেন যে অতীন বাবু? চলুন এক সঙ্গে যাওয়া যাক্।—কোথায়? না, মেথরদের বস্তিতে; হঠাৎ গিয়ে প'ড়ে ওদের মদ খাওয়া বন্ধ করতে হবে।—সর্ব্বশরীর জ্বলে উঠল। বললুম, মদ তো বন্ধ করবে, তার বদলে দেবে কী।—বিষয়টা নিয়ে এতটা উত্তেজিত হবার দরকার ছিল না।—ফল হোলো, যারা চলে যাচ্ছিল তারা দাঁড়িয়ে গেল। সুরু হোলো,—আপনি কি তবে বলতে চান—তীব্রস্বরে ব'লে উঠলুম—কিছু বলতে চাইনে।—এতটা বেশি ঝাঁজও বেমানান হোলো। গলা ভারি ক'রে তোমার দিকে আধখানা চোখে চেয়ে বললুম—তবে আজ আসি।—দোতলায় তোমার ঘরের সামনে পর্য্যন্ত এসে পা চলতে চায় না। কী বুদ্ধি হোলো বুকের পকেট চাপড়িয়ে বললুম, ফাউণ্টেন পেনটা বুঝি ফেলে এসেছি! বটু বল্‌লে,—আমিই খুঁজে আনছি—ব'লেই দ্রুত চলে গেল ছাদে। পিছু পিছু ছুটলুম আমি।

খানিকটা খোঁজবার ভান ক'রে বটু ঈষৎ হেসে বল্‌লে,—দেখুন তো বোধ করি পকেটেই আছে। নিশ্চিত জানতুম আমার ফাউণ্টেন পেনটা আবিষ্কার করতে হোলে ভূগোল সন্ধানের প্রয়োজন আমার নিজের বাসাতেই। স্পষ্ট বলতে হোলো, এলাদির সঙ্গে বিশেষ কথা আছে। বটু বল্‌লে, বেশ তো অপেক্ষা করছি।—আমি বললুম, অপেক্ষা করতে হবে না, যাও।—বটু ঈষৎ হেসে বললে, রাগ করেন কেন অতীনবাবু, আমি চললুম।"

আবার পায়ের শব্দ শুনে অতীন চম্‌কে উঠে থামল। অখিল এলো ছাদে। বললে,—"কে একজন এই চিরকুট দিয়েছে অতীনবাবুকে। তাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি।"

এলার বুক ধড়াস করে উঠল, বললে "কে এলো ?"

অতীন বল্‌লে, "বাবুকে ঢুকতে দাও ঘরে।" অখিল জোরের সঙ্গে বল্‌লে, "না, দেব না।"

অতীন বল্‌লে, "ভয় নেই, বাবুকে তুমি চেনো; অনেকবার দেখেছ।"

"না চিনিনে।"

"খুব চেনো। আমি বলছি, ভয় নেই, আমি আছি।"

এলা বললে, "অখিল, যা তুই মিথ্যে ভয় করিসনে।"

অখিল চলে গেল।

এলা জিজ্ঞাসা করলে, "বটু এসেছে না কি?"

"না বটু নয়।"

"বলো না, কে এসেছে। আমার ভালো লাগছে না।"

"থাক সে কথা, যা বলছিলুম বল্‌তে দাও।"

"অন্তু, কিছুতেই মন দিতে পারছিনে।"

"এলা, শেষ করতে দাও আমার কাহিনী। বেশি দেরি নেই।—তুমি উঠে এলে ছাদে। মৃদুগন্ধ পেলুম রজনীগন্ধার। ফুলের গুচ্ছটি সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলে একলা আমার হাতে দেবে ব'লে। আমাদের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে অন্তর জীবনলীলা সুরু হোলো এই লাজুক ফুলের গোপন অভ্যর্থনায়, তার পর থেকে অতীন্দ্রনাথের বিদ্যাবুদ্ধি গাম্ভীর্য্য ক্রমে ক্রমে তলিয়ে গেল অতলস্পর্শ আত্মবিস্মৃতিতে। সেইদিন প্রথম তুমি আমার গলা জড়িয়ে ধরলে, বললে, এই নাও জন্মদিনের উপহার—সেই পেয়েছি প্রথম চুম্বন। আজ দাবী করতে এসেছি শেষ চুম্বনের।"

অখিল এসে বললে, "বাবুটি দরজায় ধাক্কা মারতে সুরু করেছে। ভাঙল বুঝি। বলছে, জরুরী কথা।"

"ভয় নেই অখিল, দরজা ভাঙবার আগেই তাকে ঠাণ্ডা করব। বাবুকে ঐখানেই অনাথ করে রেখে তুমি এখনি পালাও অন্য ঠিকানায়। আমি আছি এলাদির খবর নিতে।"

এলা অখিলকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তার মাথায় চুমো খেয়ে বললে, "সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার, ভাই আমার, তুই চলে যা। তোর জন্যে ক-খানা নোট আমার আঁচলে বেঁধে রেখেছি, তোর এলাদির আশীর্ব্বাদ। আমার পা ছুঁয়ে বল্, এখনি তুই যাবি, দেরি করবিনে।"

অতীন বললে, "অখিল, আমার একটি পরামর্শ তোমাকে শুনতেই হবে। যদি তোমাকে কখনো কোনো প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করে তুমি ঠিক কথাই বল্‌বে। বোলো এই রাত এগারোটার সময় আমিই তোমাকে জোর করে এ বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি। চলো কথাটাকে সত্য করে আসি।"

এলা আর একবার অখিলকে কাছে টেনে নিয়ে

বল্‌লে, "আমার জন্যে ভাবিস্‌নে, ভাই। তোর অন্তু-দা রইল, কোনো ভয় নেই।"

অখিলকে যখন ঠেলে নিয়ে অতীন চলছে এলা বল্‌লে,—"আমিও যাই তোমার সঙ্গে অন্তু।"

আদেশের স্বরে অতীন বল্‌লে, "না, কিছুতেই না।"

ছাদের ছোটো পাঁচিলটার উপর বুক চেপে ধরে এলা দাঁড়িয়ে রইল—কণ্ঠের কাছে গুম্‌রে গুম্‌রে উঠতে লাগল কান্না, বুঝলে আজ রাত্রে ওর কাছ থেকে চির-কালের মতো অখিল গেল চলে।—

ফিরে এল অতীন। এলা জিজ্ঞাসা করলে, "কী হোলো, অন্তু?"

অতীন বললে "অখিল গেছে। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছি।"

"আর সেই লোকটি?"

"তাকেও দিয়েছি ছেড়ে। সে বসে বসে ভাবছিল কাজ ফাঁকি দিয়ে আমি বুঝি কেবল গল্পই করছি। যেন নতুন একটা আরব্য উপন্যাস সুরু হয়েছে। আরব্য উপন্যাসই বটে, সমস্তটাই গল্প, একেবারেই আজগবি গল্প। ভয় করছে এলা? আমাকে ভয় নেই তোমার?"

"তোমাকে ভয়, কী যে বলো!"

"কী না করতে পারি আমি! পড়েছি পতনের শেষ সীমায়। সেদিন আমাদের দল অনাথা বিধবার সর্ব্বস্ব লুঠ করে এনেছে। মন্মথ ছিল বুড়ির গ্রাম-সম্পর্কে চেনা লোক—খবর দিয়ে পথ দেখিয়ে সে-ই এনেছে দলকে। ছদ্মবেশের মধ্যেও বিধবা তাকে চিনতে পেরে ব'লে উঠ্‌ল,—মনু, বাবা তুই এমন কাজ করতে পারলি? তারপরে বুড়িকে আর বাঁচতে দিলে না। যাকে বলি দেশের প্রয়োজন সেই আত্ম-ধর্ম্মনাশের প্রয়োজনে টাকাটা এই হাত দিয়েই পৌঁচেছে যথাস্থানে। আমার উপবাস ভেঙেছি সেই টাকাতেই। এতদিন পরে যথার্থ দাগী হয়েছি চোরের কলঙ্কে, চোরাই মাল ছুঁয়েছি, ভোগ করেছি। চোর অতীন্দ্রের নাম বটু ফাঁস করে দিয়েছে। পাছে প্রমাণা-ভাবে শাস্তি না পাই বা অল্প শাস্তি পাই সেইজন্য পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের মারফৎ সে মকর্দ্দমা ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে দায়ের না হয়ে যাতে বাঙালী জয়ন্ত হাজরার এজলাসে ওঠে কমিশনরের কাছ থেকে সেই হুকুম আনাবে ব'লে মন্ত্রণা করে রেখেছে। সে নিশ্চিত জানে, কাল ধরা পড়বই। ইতিমধ্যে ভয় কোরো আমাকে, আমি নিজে ভয় করি আমার মৃত

আত্মার কালো ভূতটাকে। আজ তোমার ঘরে কেউ নেই।"

"কেন, তুমি আছ।"

"আমার হাত থেকে বাঁচাবে কে?"

"নেই বা বাঁচালে।"

"তোমারি আপন মণ্ডলীতে একদিন যারা ছিল এলাদির সব দেশ-ভাই—ভাইফোঁটা দিয়েছ যাদের কপালে প্রতিবৎসর—তাদেরই মধ্যে কথা উঠেছে যে তোমার বেঁচে থাকা উচিত নয়।"

"তাদের চেয়ে বেশি অপরাধ আমি কী করেছি?"

"অনেক কথা জানো তুমি, অনেকের নাম ধাম। পীড়ন করলে বেরিয়ে পড়বে।"

"কখনোই না।"

"কী করে বলব যে-মানুষটা এসেছিল আজ, এই হুকুম নিয়েই সে আসেনি? হুকুমের জোর কত সে তো জানো তুমি।"

এলা চমকে উঠে বল্‌লে, "সত্যি বলছ অন্তু, সত্যি?"

"একটা খবর পেয়েছি আমরা।"

"কী খবর?"

"আজ ভোররাত্রে পুলিশ আসবে তোমাকে ধরতে।"

"নিশ্চিত জানতুম একদিন পুলিশ আমাকে ধরতে আসছে।"

"কেমন করে জানলে ?"

"কাল বটুর চিঠি পেয়েছি, সে খবর দিয়েছে পুলিশ আমাকে ধরবে, লিখেছে—সে এখনো আমাকে বাঁচাতে পারে।"

"কী উপায়ে ?"

"বলছে, যদি আমি তাকে বিয়ে করি তাহোলে সে আমার জামিন হয়ে আমার দায় গ্রহণ করবে।"

অন্ধকার হয়ে উঠল অতীনের মুখ, জিজ্ঞাসা করলে, "কী জবাব দিলে তুমি ?"

এলা বললে, "আমি সেই চিঠির উপরে কেবল লিখে দিলুম, পিশাচ। আর কিছু নয়।"

"খবর পেয়েছি, সেই বটুই আসবে কাল পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে। তোমার সম্মতি পেলেই বাঘের সঙ্গে রফা করে তোমাকে কুমীরের গর্ত্তে আশ্রয় দেবার হিতব্রতে সে উঠে পড়ে লাগবে। তার হৃদয় কোমল!"

এলা অতীনের পা জড়িয়ে ধরে বল্‌লে, "মারো আমাকে অন্তু, নিজের হাতে। তার চেয়ে সৌভাগ্য

আমার কিছু হোতে পারে না।" মেঝের থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অতীনকে বারবার চুমো খেয়ে খেয়ে বল্‌লে, "মারো এইবার মারো।" ছিঁড়ে ফেললে বুকের জামা।

অতীন পাথরের মূর্ত্তির মতো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এলা বল্‌লে, "একটুও ভেবো না অন্তু। আমি যে তোমার, সম্পূর্ণই তোমার—মরণেও তোমার। নাও আমাকে। নোংরা হাত লাগতে দিয়ো না আমার গায়ে, আমার এ দেহ তোমার।"

অতীন কঠিন সুরে বল্‌লে, "যাও এখনি শুতে যাও, হুকুম করছি শুতে যাও।"

অতীনকে বুকে চেপে ধরে এলা বলতে লাগল।—"অন্তু, অন্তু আমার, আমার রাজা, আমার দেবতা, তোমাকে কত ভালোবেসেছি আজ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ক'রে তা জানাতে পারলুম না। সেই ভালোবাসার দোহাই, মারো, আমাকে মারো।"

অতীন এলার হাত জোর ক'রে ধ'রে তাকে শোবার ঘরে টেনে নিয়ে গেল, বল্‌লে,—"শোও, এখনি শোও। ঘুমোও।"

"ঘুম হবে না।"

"ঘুমোবার ওষুধ আছে আমার হাতে।"

"কিচ্ছু দরকার নেই অন্তু। আমার চৈতন্যের শেষ মুহূর্ত তুমিই নাও। ক্লোরোফরম এনেছ? দাও ওটাকে ফেলে। ভীরু নই আমি; জেগে থেকে যাতে মরি তোমার কোলে তাই করো। শেষ চুম্বন আজ অফুরান হোলো! অন্তু! অন্তু!"

দূরের থেকে হুইসিলের শব্দ এলো।

ক্যাণ্ডি, সিংহল
৫ জুন, ১৯৩৪।